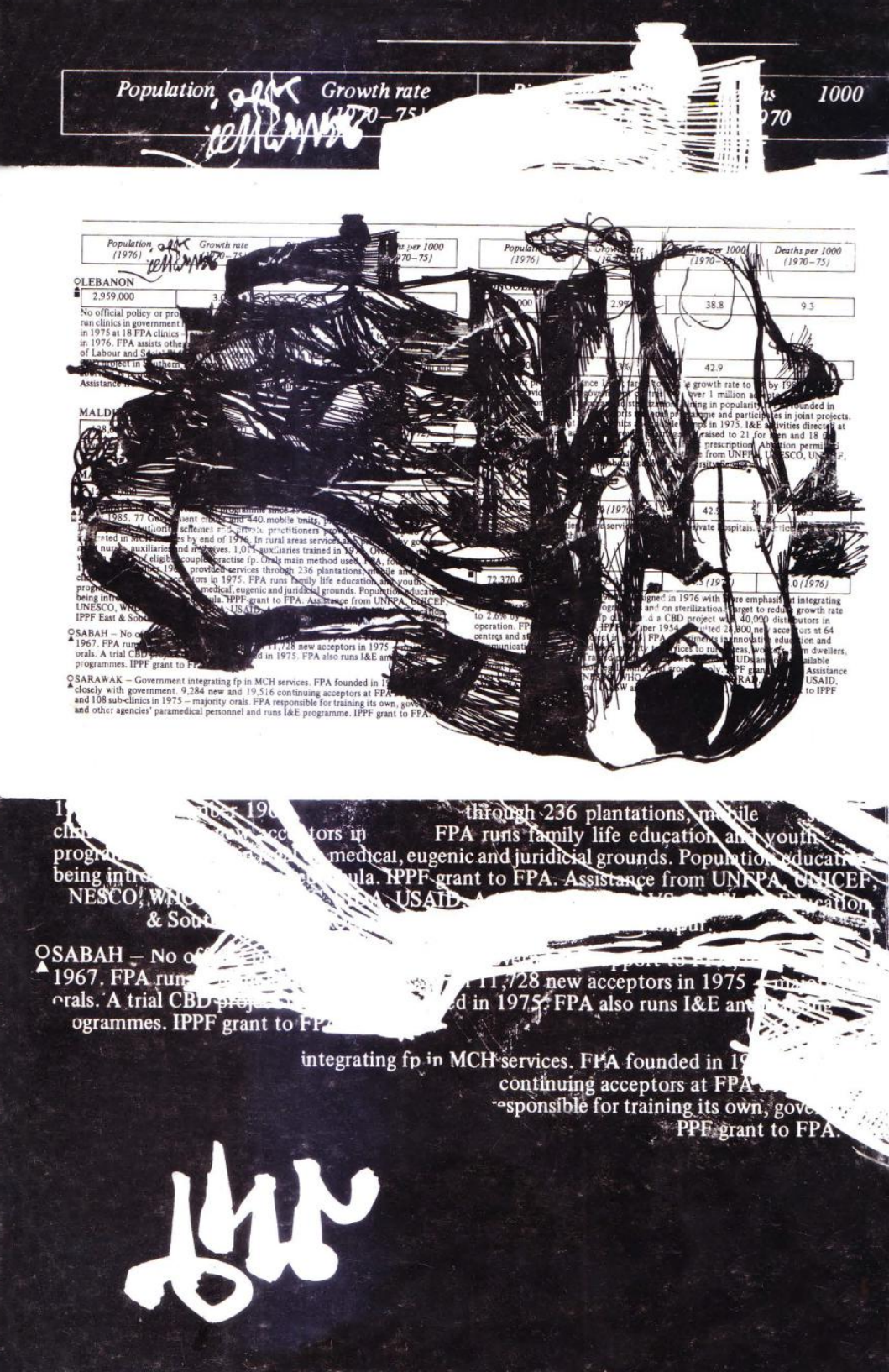

Population
Growth rate
1000
through 236 plantations,
FPA runs family life education
medical, eugenic and juridicial grounds.
IPPF grant to FPA. Assistance from
USAID
SABAH – No
1967. FPA
11,728 new acceptors in 1975
orals. A trial CBD
in 1975. FPA also runs I&E
ogrammes. IPPF grant to
integrating fp in MCH services. FPA founded in
continuing acceptors at FPA
sponsible for training its own,
PPF grant to FPA.

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - এ রুমন
স্ক্যান করেছেন - এ রুমন
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

নদী
কবিতাপত্র
দ্বিতীয় সংখ্যা
জানুয়ারী-মার্চ'৮৯

''আমি প্রেমিক; আমি এমন এক পৃথিবীর প্রেমিক, যে পৃথিবীকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় সমালোচনা করা যায়—কিন্তু সেসবই করতে হয় সমঝোতার সহনশীলতা ও প্রেমের প্রত্যয় নিয়ে। সকল মানুষ আর তার বহুমুখী জীবন, স্বভাবের প্রতি আমার এমন চোখ। আমি মানব; আমি মানবী।''

প্রচ্ছদের শিল্পকর্ম কাজী হাসান হাবিবের একটি স্কেচ, ১৯৮০। এই প্রতিভাধর শিল্পী বিস্ময়ের চূড়ান্তে যাবার আগেই বিস্মিত করলেন!

তাঁর ছবির গর্ভে যে বিস্ময়ের সন্তান, যে জগতের সন্ধান তার বীজ মূলতঃ এই ধরনের স্কেচ সমূহ। শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় শিল্পীর মাঝে যে দহন যে চাঞ্চল্য, সেই ক্ষণে নিকটের এক খন্ড কাগজ তাকে স্থিত করে, এ চিরায়ত। এই স্কেচটিও তেমনি। কাগজটির যান্ত্রিক মুক্তির পর শিল্পীর হাতে শৈল্পিক মুক্তি।

হাসান হাবিব স্কেচ করেছেন প্রচুর, পরীক্ষার গভীরে পরীক্ষা, উৎকর্ষের সমীক্ষা। ছবিতে বলতে বলতে চেয়েছেন মহাজগতের অসীম কথা—অস্থির চঞ্চল; অতলান্ত ছুঁয়ে।

এই সাধক শিল্পীর প্রতি আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা, চিরকালের।

পত্রিকা সম্বন্ধীয়

শুধুমাত্র মৌলিক কবিতাপত্র হিসেবে 'নদী' বছরে তিনমাস অন্তর চারটি সংখ্যা প্রকাশ করবে। উন্নত এবং পরিশ্রমী কবিতা ছাপানো হবে। ভালো কবিতা লেখার এবং পাঠানোর জন্য উদার আহ্বান থাকলো। অমনোনীত কবিতা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। প্রেরিত কবিতার সাথে প্রেরকের ঠিকানা আবশ্যক।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : নদী, ১১২, মনিপুরী পাড়া; ঢাকা-১২১৫।

বিজ্ঞাপন : পত্রিকার ভেতরের পৃষ্ঠাসমূহ সাদা কাগজে লেটার প্রেসে এবং প্রচ্ছদ শিল্পকর্ম সম্বলিত অফসেট প্রেসে ছাপা হবে।
পত্রিকার আকার ২১·৫ সে.মি×১৪·২ সে.মি। বিজ্ঞাপনের হার : সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা ১০০০·০০ টাকা; সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা ২০০০·০০ টাকা; তৃতীয় প্রচ্ছদ ৪০০০·০০; চতুর্থ প্রচ্ছদ ৫০০০·০০ টাকা।

সম্পাদক

তাজুল হক

পরিচালক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত।
বরেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস, ৮৫/২ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

বিনিময় : শুভেচ্ছা বিনিময়ে আপনার বিশেষ অনুদান আমাদের নিয়মিত প্রকাশনাকে সুগম রাখবে।

সূচীপত্র

মোহাম্মদ রফিক	৬
বায়েজীদ মাহবুব	১০
খোন্দকার আশরাফ হোসেন	১৭
মবিনুর রশীদ	২০
আহমেদ হাফিজ	২২
নির্মলেন্দু গুণ	২৫
নিশীথ মাহফুজ	২৬
শিহাব সরকার	৩১
ফকরুল আহসান	৩২
সৈয়দ শামসুল হক	৩৪
কায়সার হাসান	৩৬
রেজাউদ্দিন স্টালিন	৩৮
রেজাউল ইসলাম রাসেল	৪৩
হুমায়ুন আজাদ	৪৪
মাদুল মাহমুদ	৪৬
হেলাল হাফিজ	৫২
হুমায়ুন নাসির	৫৪
আবু মুহম্মদ রইস	৫৬
আবদুল মান্নান সৈয়দ	৫৭
অনির্বান মোস্তফা	৫৮
মহাদেব সাহা	৬০
হাসান হাফিজ	৬১
তাজুল হক	৬২
সাজ্জাদ শরীফ	৬৮
তিদিব দস্তিদার	৬৯
রিজওয়ান পাশা	৭০
রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৭২
শামীম কবীর	৭৩

সে অনেক আগের কথা। সেখানে জল ছিল। তারপর লাল সাদা পাড়; সবুজ কোকিল আর লালটিয়ের ঝাঁক; জলের ভেজা ভেজা শব্দ, সাদা ঘ্রাণ। রূপসীর রূপের মতন পৃথিবীর সবটা তখন দুপুর আর অভিমানের মত রাত। সেখানে নদী হলো। নক্সী নৌকার ধীরতা ছড়ালো সুবাস

সে এখনকার কথা। এখানে নদী আছে। আকাশটাতো নদীর ভেতরেই, রূপালী মাছ। যদি নদী হয় সবটা পৃথিবী আকাশটা হয় পাল আর বাইরের চুইয়ে পড়া শূন্যতাটা হয় পাড়; যদি বহমানতা ধর্ম হয় আর সকল কিছু ভাঁড় তবে তার মোহনায় কবিতার সংসার হয়। সেখানে উপবাসী সহিষ্ণু ধীবর জলের অদ্ভুদ শীতলতার নীচে অসীম উষ্ণতায় জালে তোলা শব্দের আয়োজনে রহস্যের অতৃপ্ত গুহায় এক নতুন মাত্রার জন্ম দেয়। সেই মাত্রা হয় ব্রহ্মান্ড পিতা। যার সুখকর জাগতিক নাম কবিতা।

সেই এক জোনাক ওড়া আঁধারে রহস্যের মোহনায় কবিতার সংসারে, সেই অনেক আগের জল, সেই পাড়, সেই কোকিল তারপর এই নদী পুজো দেয়। আর তার প্রসাদ হয়ে আসে এই কবিতাপত্র। বারে বারে অনন্ত ও নিয়তির মতো আসে। সেই অনন্তে ছিলো সেই বাংলার কোন শিল্পীর মন্ময় শ্বাস, ছিলো রৌদ্রবেলার ঘ্রাণ; এই অনন্তের শরীরে মিশে আছে শিল্পীর বুকের নিক্ষিপ্ত বাণ। এ থাকে কালে কালে। শুধু প্রতীক্ষা কোন বিস্ময়ের

কোন তরুণের বুকের ঝর্ণা থেকে আঙ্গুলের ফোয়ারায় হোক উৎসব, জোৎস্নার ডালে বসে সেই উৎসবের শিস দিক কেউ, কোন দূরগ্রহ থেকে পৃথিবীর রাতে ছড়াক আতস, হোক প্রথম প্রেমের পুনর্মিলন, ক্ষুধা হোক জয়, প্রাপকের প্রাপ্তি হোক। পৃথিবীর মানব হোক আরও রূপবান বহুগুণ হোক মানবী। হোক মৃত্যুভয় পৃথিবীর ঘ্রাণ। সে এক অন্য পৃথিবী।

খ. পুনশ্চ

লক্ষ্য করা যায়, এই কবিতাপত্রে প্রবীণ, নবীণ এবং একদল অযাচিত অতিনবীণ কবিদের অসমসত্ত্ব মিশ্রণ ঘটেছে। এবং এ ঘটনা বাহুল্য নয়। নিকট বর্তমানে বাংলাদেশে এবং তার মুখর্ মোড়ল শহর ঢাকায় যে পদ্য চর্চা চলছে এর শ্বাসরোধী দুর্গন্ধে অতীষ্ট কাব্যভক্ত। এবং কাব্যে বিষক্রিয়া সঞ্চালনে তরুণরাই অতীব সক্রিয়। কারণ আমাদের সাম্প্রতিক অধিকাংশ অগ্রজদের মধ্যম এবং নিম্নমধ্যম মানের কাব্যচর্চার পর অধিকাংশ তরুণেরা এসে সেখানে যোগ করে অপরিশ্রম, আলস্য, অবহেলা, অসততা এবং মেধা-

হীনতা। ফলে কবিতা এখন দায়মুক্ত শব্দ এবং বাক্য সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কবিতার উপর এসে পড়ছে বিভিন্ন রকম অগভীর এবং সস্তা দর্শন, দেশোদ্ধারের মহাপরিকল্পনা এবং চিন্তা ক্লান্ত, ভাবপিষ্ট ব্যক্তির উদ্ধারের উপায়। মিনতি আমাদের, ব্যক্তির ইচ্ছেমত ভাব প্রকাশের নানা মাধ্যম এবং কৌশল আছে, অন্তত কবিতাকে কলুষিত করে নয়। নিশ্চয়ই কবিতা জীবনের সকল অনুষদ থেকে তার বিষয় শোষণ করবে; রাজনীতি, ব্যক্তির যন্ত্রণা, মুক্তির স্বপ্ন সকলই সে লালিত করবে কিন্তু তা মোটেই সরলীকৃত জনসভার অথবা শিলাকৃত প্রবন্ধের বাক্যে নয়। তাকে শুধুমাত্র কবিতা হতে হবে, একমাত্র পরিশ্রম, সততা এবং মেধা যা করিয়ে নেবে। আমাদের এ সকল বাক্যব্যয়ের লক্ষ্য হলো নতুন কবি এবং শিক্ষিত ও বোদ্ধা পাঠক; তাঁরা কবিতার বিবস্ত্র শরীর যেন নিজেদের উপলব্ধির শিকারে আনেন। তাঁদের জন্য আরো দুটি বিশেষ বিশেষ্য হল; আমাদের মতে মোটামুটি কবিতা সম্পর্কে দুটি সর্বোত্তম ধারণা, দু'জন মনীষির; প্রথমটি এম. ম্যাকলিশের "A Poem should not mean, but be" এবং দ্বিতীয়টি এজরা পাউন্ডের "Poetry can communicate before it is understood"।

এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ, নতুন কবির জন্য, এটা স্বীকার্য যে তার জন্য প্রথমতঃ ছন্দ অপরিহার্য; গদ্য বা মুক্ত ছন্দে তার অবিচ্ছিন্ন কোন অবকাশ নেই; তা বরঞ্চ তার ক্ষমতাকে এবং সততাকে ক্ষয়িষ্ণু করবে।

এ পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিতরা এসেছেন নিরন্তর কবিতার জন্যেই; তাছাড়া পাতা পূরণ করার মতো তরুণের উন্নত কবিতা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে নেই। তবুও এ পত্রিকায় ক'টি অনুন্নত কবিতা প্রবেশ করেছে, এড়ানো সম্ভব হয়নি, হয়তো পরবর্তীতে হবে। এখানে পুরো পত্রিকায় নবীন প্রবীণ এবং বিভিন্ন ধররের কবিতার ভারসাম্য রেখে ক্রমসূচী করা হয়েছে এবং পরবর্তীতেও হবে।

আমাদের অনেকে নানাভাবে বিরতি এবং বিরক্তিহীনভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতিও আমাদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

পুনরায় কবিতা এবং এক উজ্জল আশাবাদ। বর্তমানে ক'জন তরুণ কবি এবং এ পত্রিকার উদ্ভাসিত ক'জন অতি তরুণের কবিতায় যে পরিশ্রম নিষ্ঠা ও মেধার ছোঁয়া পাই; যদি তাদের তা ক্রমশ গভীরে প্রোথিত হয় এবং আচারে দাঁড়িয়ে যায় তবে নিশ্চিত আমরা, এ শতকের শেষ ভাগে অথবা আগামী শতকের প্রারম্ভে সেই তিরিশের মতো আরেক বর্ণচ্ছটা প্রত্যক্ষ করবো।

মোহাম্মদ রফিক

হাড় ও মাংসের উৎসব

Only love with its science makes us so innocent.
—Violetta Parra

১.

এ কথা সত্য যে
বন্ধুদের কারও লাশ এখনো মাড়াতে হয়নি পায়ে

মশানে কারও জন্য শূল হয়নি পোঁতা
কসাই চামড়া খসাতে এখনও আসেনি কারও

তবু শকুনের নখ যে এতোটা ষড়যন্ত্রে কোকড়ানো
ঠোঁট বক্রতায় কুটিল গ্রীবা উদ্ধত স্বেচ্ছাচারিতায় ঋজু

গোরখোদকের শাবলের ঘায়ে একসঙ্গে ভেঙ্গে যায় মাটি ও পাথর
ছিঁড়ে আসে ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত্রনালী মেধা ও মগজ

হঠাৎ পা হড়কে বাইশের যুবক চেপ্টে যায় বাসের চাকায় নির্ধারিত
চোদ্দ বছরের কিশোরের হাতের পিস্তলে ঝরে পড়ে যুবতীর স্তন

কিশোরীর জরায়ু তেতে গ'লে নামে বেজন্মা সন্তানের স্নায়ু
কাক ও বিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক যে এতোটা নিবিড়

বুলেটের দুর্গন্ধ থেকে মরতে থাকে টুপ-টাপ অভিশপ্ত ধড়

২.

ভয় কামড়ে থাকে প্রতিটি দরজা
কড়া নাড়ার শব্দ মানে ইতি

বুঝি শেষ শব্দ লেখা হ'লো মনুষ্য দিনপঞ্জীর
ব[illegible]লো [illegible]পা পড়লো যথেচ্ছ মাটি চাঙড়ে

মাংসের চুল্লীতে ফোটে দুঃস্বপ্নের আনাজ
কড়া রোদ্দুরে শুকনো হাড়গোড়

কাঁটা তারে ঘেরা হচ্ছে প্রতিটি বই এর পাণ্ডুলিপি
বল্লমের ঘায়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় অব্যক্ত অক্ষরের পাঁজর

অনুচ্চারিত বাক্যবন্ধ শানান ছুরির ফলায়
বৈবাহিক তোষকে-বালিশে কাকলাসের জিভ থেকে লালা

পারিবারিক আহারের মশলা মাকড়সার জাল
ভাতের দু'মুঠো ঠাসা টিকটিকির ডিম

খিচুড়ির সাথে দু'টো বিছের দু'ভাজা
দারুচিনি-এলাচে ভুরভুর সৈনিকের রোণ্ট

শ্রমিক ও কৃষকে ঠাসাঠাসি শেষ ট্রেন এখনও গড়িয়ে পড়েনি খাদে
কিন্তু চালের গুদামে কিন্তু ঠিকই লেগেছে আগুন

৩.

লাগিয়ে দিয়েছে কেউ নির্ঘাৎ
আগুনের শিখা আর ট্রেনের সীটি একসঙ্গে

দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধে বরফের চাই
বাড়ির ছাদ ধ্বসে কান ফেটে উর্ধ্বশ্বাস

আগুন জ্বালাতে গিয়ে দেখা গেল বরফই আগুন
আগুনই বরফে-বরফে জ'মে নাক্ষত্রিক আলো

আলেয়ার ধ্বনিপুঞ্জ ছুটে আসে মানুষের কোলাহল
লোকালয়হীন লোকালয়ে শব্দ জাগে গাজনের

ঢোলের তেহাই ধোঁকে কামানের তোপ
লুঙ্গি ও শেমিজ খুলে রেখে যারা এতোদিন বৈইচী ঝোপের

অন্তরালে আদিম ফসিল
ঠোঁট থেকে ঠোঁটে সংক্রামিত করে গেছে কুষ্ঠের ক্ষত

আগুন জ্বালাতে গিয়ে পুড়েছে আগুনে
নিজের আগুনে জ্বলে আণবিক চুল্লীতে, তবু

৪.

এক খন্ড আকাশ খ'সে পড়লে ধরে রাখে চোখের মণিতে
পদ্মার দাঁড়ের শব্দ বুকে গেঁথে চালা বাঁধে মাটির সন্ত্রাসে

পাথরের বিস্ফোরণে বাঁধে খোপা আলতার আগুন ফুলকি
পাঁজরের হাড়ে-হাড়ে ছেঁড়া ত্যানা চেতিয়ে বুকের ঢিবি

লোভায় খদ্দের লোলুপ চোখের রক্তে ছায়া দেখে
উড়ে যায় বোমারু বিমান ঝাঁকে-ঝাঁকে

পৃথিবীর মহাদেশে মহাকাশের
অস্বস্তিকর মাথামাখি দিকহীন চিহ্নহীন পারাপারহীন

দেশহীন মাটিও বারুদে এলোথেলো কোন এক শেয়ালের ছাও
কিংবা বাপ টেনে নিয়ে যাবে লাশ

অথৈ গাঙ্গের
পচা মাংসে একদিন স্বাদ পাবে সাগরের নোনাজলের

৫.

ফুলে ফেপে কর্দমাক্ত বন্ধুদের কবোষ্ণ লাশ আজও কিন্তু মাড়াতে হয়নি পায়ে
তবু সম্ভাবনার দায়

মার্চপাস্টের ধ্বনি, কলের চিমনীতে ধোঁয়া, ট্যাক্সির হর্ণ
সাহেবের খাটে বেগম ডাকে নাক, নীচে

চাকরানীর উসখুস
সাহেবের তড়পায় বুক ধমনী অস্থির

তালায় নাড়া শুনলেই কাঁপে ঘর, ছুরিও শানানো
হয় ভাগাড়ে, কসাই এর দোকানে, হুজুরের মক্তবে

শুধুমাত্র বেহেড মাতালই পড়ে থাকে ডেনে, কুকুরের প্রস্রাবে
বেহেশতের সুরা

বারুদের গন্ধ কিন্তু হাবিয়া দোযখ আসমান ও মাটি
সর্বত্রগামী

লুঙ্গির খোটাও যার গেছে খুলে, কিংবা ঝুড়ে উড়ে গেছে শরমের
নিঃসম্বল রক্তছেঁড়া শায়া

তবে শ্বাস গোনা হাস্যকর
শুধুমাত্র দায় ও দায়িত্ব ঠিকানাহীন

চালচিত্র

ব্রহ্মপুত্র তীরে কুড়ে ঘর।
সন্ধ্যার নিভন্ত আলো চোখে নিয়ে বসে আছে বৃদ্ধা এক।

দূরে থেকে শব্দ ছোটে। তীর আঁটা।
পাড়ের বিরাট একখাবলা ফের গিলে ফেললো ব্রহ্মদৈত্য।
কুঁড়েটার কাছাকাছি চলে আসে জল। খল-খল হাসে ঢেউ!

বয়সের মাপ নেই। হ'তে পারে আশি কিংবা নব্বুই বা একশ'।
একা বৃদ্ধা বসে আছে চোখে আলো নিভন্ত সন্ধ্যার।

ব্রহ্মপুত্র তীর জুড়ে সমগ্র তল্লাটে ভারী হ'য়ে অন্ধকার কিংবা আলো
বোঝা ভার। কতোদিন তার ঘরে জ্বলেনি পিদিম ভুলে গেছে।

জলের হুঙ্কার নাদে ভয়ার্ত বাছুর ডেকে ওঠে।

বৃদ্ধার দু'গাল বেয়ে নামে জল। লবণাক্ত নয়,
অন্য তার স্বাদ।

বায়েজীদ মাহবুব

নির্বাণে নিশিডাক

ফেলে দে সামাজিক সভার মালা ঃ নষ্ট শহরের কীট ঃ
ফিরে যা শৈশবের মুক্তমাঠে রোদ্রে ভিজিয়ে আর্ত পিঠ;
মমতায় এর চেয়ে বেশী পাবি সেবা ঃ প্রেমের কিরীট !

কষে দে বাঁধন সাপেকাটা ক্ষতে ঃ শুষে নে সমূহ বিষ
লবেজান প্রেমের বাগান আগে বাঁচা; পরে তাতে দিস
জল-সার ঃ পৃথিবীর কাছ থেকে কেড়ে নিস স্নেহাশিস !

কেটে দে নিজের উত্থান ঃ নাগরিকা ধাত্রীর জন্মনাড়ী ঃ
ফিরে যা অনার্যের প্রত্নতত্ত্বে ঃ এখনো গাঢ় ঘরবাড়ী
গড় গহীন শিকড়ে ঃ শিরায় উঠবে ফুঁসে ক্রুদ্ধ মারী !

ছুঁড়ে দে সোনার শেকল ঃ কানপাশা, বিষাক্তবিছা, নথ ঃ
ছুঁড়ে দে আঁচলে লুকানো আগুন ঃ মুক্তির শুদ্ধ শপথ;
ছিঁড়ে ফ্যাল আঁটো কাঁচুলি ঃ আরো ভেতরের প্রেমের গৎ !

পরে নে উর্বরী ঘাঘরা ঃ বুনে দে তাতে প্রেম ও মনীষা
শস্যস্নাতা দেহে বুলিয়ে দে মাটি গন্ধঃ সুন্দরের তৃষা !

কবিতারণ্যে মৃগয়া

১.

শব্দের মৃগতৃষ্ণায় ভাবিনি কখনো পরাজিত
হবো আমি তবু আজ প্রাতঃ ভ্রমনে নম্র বালিকা
মাথা নুয়ে চুপচাপ হেঁটে গ্যালো আমার সমুখ
দিয়ে একা; "ভালো আছো ?" উত্তরে রক্তিম দুইঠোঁটে
শব্দহীন ঢেউ তুলে তন্বী লজ্জায় আরো নমিত

পালালো ছুটে। আমাকে ঘোরবন্দী করে স্মৃতিশিখা
বিস্তারিত কিছুক্ষণ পোড়ালো আমার দুঃস্থ বুক
আর ঘরে ফিরে দেখি যে অশ্ব আমার দীপ্র ছোটে
মনোভেদী প্রান্তরের মাটিতে বিষম শব্দ তুলে
নিহত সে পড়ে আছে দলিত ঘাস ভরা উঠানে
আলুথালু রমণীর সাজে বসে আছে প্রিয়তমা
ছন্দের কাকাতুয়া ও কবিতার খাতা ঘরছেড়ে
চলে গ্যাছে যেনবা সে ধর্ষিতা এই লজ্জামাশুলে
নিরুদ্দিষ্ট বহুদিন। বিপর্যস্ত ঘরের শ্মশানে
বসে ভাবি, মায়াময়ী! কবিতার সুন্দরী উপমা
ফেলে নিঃহৃদয়ী বুকে কোন প্রেম আসে কড়ানেড়ে !!

২.

মায়াময়ী! ক্যানো নিলে কেড়ে স্বপ্ননগরীর চাবি
আমার এ ছিন্নমূল আত্মার একক গুপ্তধন ঃ
আর দিলে রক্তদাহী প্রেম, অস্তিত্বে নিত্য বহতা
স্বপ্নখোর একনদী। এর চেয়ে ভালোছিলো ঢের
স্বপ্নাতুরা অনিদ্রায় বসবাস প্রেম নাকছাবি
খোঁজা অষ্টম প্রহরে তুমি নীলতন্দ্রায় যখন
শয্যাপাশে নীরবাশ্রু ঝরিয়ে বিরহে সমর্পিতা
একোন খেলায় মেতে আমার ভাঙাঘর নিজের
তীরে মিশালে ধুলায়! বলো ও মায়াবতী কী পেলে
হও খুশী ঃ রক্ত, প্রেম নাকি সংসার; অকৃপণ
ধমণীর শেষ বিন্দু, হৃদয়ের অনন্তবিসারী
প্রেম আর ক্রীতদাস সাজা গোছানো গেরস্থালীর
সৌন্দর্যিত চিত্রনাট্য আকুল তৃষ্ণায় দেবো তুলে
তোমার বেদীতে; শুধু জীবন্মৃত দেহ আমরণ
ভরিয়ে দাও শব্দান্নে, ফিরিয়ে দাও অভীক নারী
আর বুকের জোস্নায় ঝরে পড়া অমৃত শিশির।

৩.

কী নিষ্ঠুরা তুমি প্রেম! তুমি তার উদ্ভিন্ন শরীরে
জড়ানো শুভ্রশাড়ীতে সেঁটে আছো সফেদ আলোর

ফেনায় সুস্মিত তার চিবুকের নিটোল রেখায়
চুলের ঔজ্জ্বল্য চুঁয়ে নেমে চলেছো হিরণ্যগর্ভা
শান্তির অন্তরীপে। কী এক অলোক উদ্ভাসে ঘিরে
আছো ক্ষীণতনু তাকে যে আমার দীপ্র ঘরদোর
আর কবিতা-হরিণী; কাব্য সুন্দরের জড়োয়ায়
ছিলে আভরণা তুমি হে প্রেম, শিশিরস্নাতা দূর্বা
রৌদ্রে যেমন ছড়ায় রেশম; অথচ শব্দনিঃস্ব
আমি তাকিয়ে দেখি সে শব্দদস্যু সুবর্ণসত্য
ও কবিতার মতন সুন্দরে নিয়ত হাস্যময়ী ঃ
আর প্রেম তুমি তাকে জড়িয়েছো শব্দ-ঝংকারে
অন্তমিলে কিম্বা শুদ্ধ অনুপ্রাসের সুকারুদৃশ্য
মর্মরে; আমার রিক্ত উঠানে সেই সুন্দর নিত্য
ম্যালে ছায়া আর আমি সে কবিতাময়ীর বিজয়ী
প্রেমপুষ্পে গাঁথি মালা ঃ কবিতার বিলোল আকারে।

ভালোবাসা পেলে

ইচ্ছে ছিলো ভালোবাসা পেলে খুলবো লঙ্গরখানা
বিলিয়ে দেবো দানছত্রে যা কিছু আমি এতকাল
করেছি সঞ্চয়; ভুখাদের এনে বসাবো বিশাল
দস্তরখানে—প্রেমলীন, প্রেমাইত কোন সীমানা
দেবো না বেঁধে। রঙীন বেলুন ছড়াবো মাঠে মাঠে
উল্লসিত বালকেরা ফড়িং এর মতো তুমুল
হট্টগোলে কুড়াবে সেসব; স্নানসারা ভেজাচুল
কোন কিশোরীকে কিনে দেবো চিরুনী। পুকুরঘাটে
নির্জনে আঁকানো সিঁথির গভীর দাগে ইচ্ছাভ্রূণ
দেবো বুনে। ভালোবাসা পেলে বড় ইচ্ছে একবার
মরে যাবো; অপমান হবো সামন্তের কাছে। কত
নিষ্ঠুর হতে পারো দেখবো হে দুঃখ, বীরের মত
হারিয়ে দেবো তোমার সন্তানদের। কেননা দ্বার-
ভাঙা ভালোবাসা পেলে হাতে পাবো দুঃখভেদী তূণ।

অন্তর্গত পরোক্ষে

পৃথিবীর সব রঙ সৌন্দর্যের চোখ চুঁয়ে বন্দী
এখন হৃদয়ের এ গোপন তৈলচিত্রে। একাকী
একটি বুক নির্নিমেষে দেখে নেয় ঘরে ফেরা পাখি,
গৃহত্যাগী মানবিক প্রেম আর ফুল্ল-প্রতিদ্বন্দ্বী
নখরিত ধূসরকে। বুকের গুপ্ত ত্রিভুজ-সন্ধি
ঘেঁটেও যে সবুজাভ দয়িতার মুখ থাকে বাকি
উদ্‌ঘাটনের; আমিতো অন্ধচোখেও সেই ফাঁকি
স্পষ্ট দেখি, সুন্দরের নীচে দেখি করালী কালিন্দী।

তুমি শুধু রহস্যিনী, দুর্ভেদ্য স্বয়ম্বরা মহিমা;
এত অভিজ্ঞান আর হাতে ধরা সৌন্দর্যের চাবি
কিছুতে দাও না ধরা, কৃষ্ণতিথিতে পূর্ণ পূর্ণিমা
ফোটাও হঠাৎ কিংবা স্বচ্ছল দোতারায় অভাবী
সুর বাজাও নিমেষে! খুঁজে খুঁজে তোমার নীলিমা
ক্লান্ত আমি; পাশে তুমি তবুও ঃ স্বনিত মৃগনাভী।

জল পুরাণ

জল থেকে ঝরে জল একাকী বর্ষায় অবিরল—
শিলার চিবুক বেয়ে, যেনবা সঞ্চিত ঘামফোঁটা;
শিশিরের শান্তি মেখে স্নিগ্ধ গোলাপের বোঁটা
হয় আরও সবুজ। জল, তোর কই জন্মস্থল?
বরফের বুকে বুঝি জমা আছে তন্বী কোলাহল
জল থেকে জল হয়ে তারপর শুরু তোর ছোটা
ভাসিয়ে সবুজ সব দিগন্ত ছুঁইয়ে জেগে ওঠা
একাকী রাজত্বে; জল, বুকে তোর কে দিলো অনল?

জল তোর জলো বুকে এত অভিমানী জনস্থল,
এতটা সন্ন্যাস আর অজস্র দুঃখের টেরাকোটা,
কিন্নরস্তবে এতটা সমর্পণ, এত মাথা খোটা
জল, বিনা মন্থনেই তবু ক্যানো দিলি হলাহল?
সুন্দরে ও কুৎসিতে একাকার মিশেছিস জল
তুই কী আমার প্রেম তবে ঃ মরণজয়ী সম্বল!

দুঃখসেঁচা প্রজ্ঞতত্ত্ব

মারীর কুষ্ঠ ক্ষতে নিষ্প্রাণ ধাঁধাপথে স্বপ্নভ্রষ্ট ঘুরি নিরালোকে একা
সুখের সান্দ্রমুখ তন্দ্রায় জাগরূক দুঃখের সুন্দরী জয়ী কররেখা।
বুভুক্ষু প্রস্তরে কাঁদুনী শূন্যঘরে মরণের ধীর বিষে প্রেম বিবসনা,
হলুদ গাছালি ভরা হৃদয়ে অজর জরা নিয়েছে ব্যাপক শুষে ব্যর্থ সাধনা।
বিবাগী হৃদয়তান অশরীরী নির্বাণ ঝোড়োস্বরে চেয়েছিল, গড়তে সখ্য;
নগ্নিকা হৃদকূপে অলোভী গণিকা রূপে প্রেম শুধুই দেখালো ভ্রূর কটাক্ষ!
বিনষ্ট উদ্যানে আহত দারুণ বাণে ক্ষুব্ধ নিরাশ্রয়ী নিঃস্বজ প্রেমে
উদ্যত খঞ্জরে বিপন্ন চত্বরে যূপের হিরন্ময়ী গাঢ় যাই নেমে।

মঞ্জুল চিরসাধ উড়াচ্ছে প্রতিবাদ একাকী ছড়ায় ক্রোধ বলয়ী গুহাতে
শয্যাহত রমণীর শেষাক্ত কূটতীর হতে পরাজিত বোধ বাঁচাই দু'হাতে
রিক্তযোদ্ধা আমি বস্তুতঃ সংগ্রামী স্বেদ ঝরাই ভীষণ মনোপথ দলে,
শরীরীয় প্রমানুগ আমার চেতনাযুগ দেখে শুধু শিলাস্তন জ্বলে দেহানলে।
এক ঘেয়ে গৃহলীলা হানা দেয় সর্পিলা তন্বীতে, অনুকৃতি প্রেমের ছোবল
ঝাঁপিয়ে যাবো কী তবে দহনের অর্ণবে? কেননা জীবনীবৃত্তি অস্তি গরল!

সমর্পণ

নিত্যচলা শূন্যপথে দু'কান টানা সংসারে,
জৈবমদে মৌনব্রতে ঘুরছি তবু বারেবারে।
মৃত্যুপণ বুভুক্ষায় অন্ধ আমি দীপ্যঘরে
হৃদয় স্রোত কীর্ণতায় দীর্ণ হয় দুঃখশরে।
তবুও আসে সূর্যোদয় অন্ধকার গর্ভচিরে,
অথচত ব্যর্থপ্রণয় শূন্যতেই আসছি ফিরে।
বৃত্তঘেরা সীমানাতে কুটছি মাথা অহর্নিশ,
জরার রূঢ় প্রত্যাঘাতে চলছি শুষে মৃত্যু বিষ।

স্বপ্নভঙ্গ রাত্রিশেষে চতুর্দিকে দৈনভার,
তীব্র ঝড়ে বন্ধুবেশে নিচ্ছে খোঁজ কেউ আমার!
দুস্থবুকে দীপ্রপ্রেম দেইনি কভু পৃথিবীকে।
বিধাতার ভক্তিহেম চল্ল ছুটে অস্তদিকে।
কীটদষ্ট ব্যর্থমালী যাচ্ছি চলে মৃত্যুরাতে
দিচ্ছি তুলে গেরস্থালী ও ছেলে তোর দু'হাতে।

স্বপ্নবন্দী, পাতক অথবা

স্বপ্নময় রৌদ্রে হাঁটে, অবিকল সুমদ্র সন্ধানী;
বুকের নিজস্ব নেমির একাকী বাগানে নিমগ্ন
বুনে যায় সান্দ্র স্বপ্নের চারা—অতন্দ্র মুগ্ধতায়।
কী তাকে বলবে বলো : মেকী নাটুকে ছেলেমিপণা
কিংবা ব্যক্তিগত ঘরে আত্মহত রক্তাক্ত ইগো ... ...

নিঃসঙ্গতার বৃক্ষে আশৈশব দোল খেয়ে বেসেছে
গূঢ় আকাংখায় নারীকে ভালো অথবা অদ্ভুদ
মোহে চেয়েছে সত্তার দ্বিত্বতা; রমণীর অন্দরে
দুর্গম শিখর দেখে শোণিতে অভিযাত্রিক নেশা,
এই প্রেম আর রমনীদের সর্বময়ী প্রত্যাশা
নিটোল ছন্দে গড়েছে তার জরাসন্ধ কনীণিকা।।
সে চায় নিদ্রিত সুখ জাগাতে পুনর্বার; যদিও
অতীত তাঁর ভ্রূর ক্রুর হাসিবিদ্ধ আবহমান
রূপান্তরে। এতকাল ক্রমাগত দুঃখের বেতাল
সিঁড়ি উজিয়েও অধরা অবয়ব; সফেদ ফেনা,
ভেবেছিল আদিগন্ত ঢেকে দেবে তার, প্রসবান্তা
কোন রমণীমুখ কিংবা জরায়ুর অন্ধকারে ... ...

অতর্কিত বয়সের হানার মতো সে মানচিত্রে
হয়তোবা চেয়েছিল নিজস্ব মুদ্রাময় নর্তকী :
ফসলে উপচানো গোলায় নিঃসীম নিদ্রার রেণু
উন্মুখ ছড়াবে মাতাল জলসায় ; জ্যোৎস্নাগন্ধী
স্নিগ্ধতা দেবে ছুঁড়ে ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় নহবতে ... ..
যেন অশরীরী প্রেত কোন না আসে তীক্ষ্ণাগ্র দাঁতে
ছুটে মধ্যরাত্রি বিচূর্ণকরা অশুভ চীৎকারে।
অভিলাষ তার স্বনির্মিত : স্বয়ম্ভু স্বর্ণমুকুটে;
চৌকষ কুমন্ত্রে সেঁধিয়ে চায়নি পদতলে কভু
টলমল ভূভাগ, তার চে' ভেবেছিলো ভালো ঢের
গেরুয়া ধূলোয় মেখে হৃদয়ের ভেতর বাহির
নির্জনে মেতে ওঠা সুন্দরের জৈবনিক ক্রীড়ায় ... ...
অথচ দুঃখের জটিল শিকলে স্বপ্নের চৌরঙ্গী

দুপায়ে মাখে ঘা : চোখের আরশীতে লাস্যময়ীরা
করে নিভৃত প্রসাধন—নগ্না বল্লরী অনুপুঙ্খ
খুঁটিয়ে ; দ্যাখে কত রূপভুক শোষে ষোড়শী যোনি ... ...
তবু থাকেনা কেউই দর্পনে সুস্থিমতা সর্বক্ষণ
মৌন দুঃখের ভয়াল নেকড়ের দীপ্র সংহারে ... ...
বালখিল্য আস্তিন চেপে নির্বীর্য দুহাতে নিঃশব্দ
পড়ে থাকে মিছিলী শব্দময় রাজপথ, ধর্ষিতা
শহুরে শান্তিস্তম্ভে হিংস্র দাঁত ও সুন্দরছেদী
নখর রাত্রিভর লেখে পোষ্টার আর নর্দমায়
কন্ট্রাসেপটিভের পাশে ভেসে চলে নষ্ট ভ্রূণ। সে
শুধু রাতক্লান্ত বেশ্যার মত ঘুমায় ফুটপাতে ... ...

পদতলে মথিত পুরুষ; রমণী ও ভূগোলের :
শুধু সে মুগ্ধ বুনে চলে সান্দ্র স্বপ্নের চারা বুকে
কী তাকে বলবে বলোঃ আজন্ম ক্রীতদাস লুকানো
হৃদয়ে কিংবা ব্যক্তিগত ঘরে আত্মহত ইগো ... ...

প্রিয়সাধ

ভালোবাসা চেয়েছিলো কিশোরী
চেয়েছিলো কিশোর তাকে তুলে নিক বুকে
দুটো হৃদয় থাক মিশে এক সাথে
একই পাঁজরার ধুকপুকে
ইচ্ছেমত তাই কিশোরী
উড়িয়েছিলো স্বপ্নিল শ্বেতপরী।
চায়নি সে ঝড় হোক ঘরভাঙা সর্বনাশী
যেমন সে উপবাসী কিশোরে,
চায়নি সে নির্জনতা একা থেকে শূন্যঘরে
করেনি সে বুকভরা আশা
চেয়েছিল রঙীন কাঁচের ত্রিশিরায়
দু'জনে শিখবে ভালোবাসা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন

পাখি

দ্যাখো পোষা পাখিটিকে দ্যাখো
দ্যাখো তার নীল—ছায়া চোখের ভেতরে
প্রাণের কোটরে
রৌদ্রপাত, অনন্তের ঝঞ্ঝাবারি, কাটা
ঘুড়ির উল্লাস, দ্যাখো বুকের ভেতর
জোনাকির আলোর শহর।

কাল থেকে
সে ঘুমোয় দাঁড়ে বসে, তাকে
বিড়ালের থাবা এসে ডেকে যায় নাম,
বাহিরে প্রমত্ত ঘাম, রৌদ্র আর তাপ
ভাতের মালসা থেকে ভাঁপ
ওঠে জীবনের, তুমি
দ্যাখো পোষা পাখিটিকে দ্যাখো
দ্যাখো আজ ক্রুদ্ধতার ঠোঁটের ভেতরে
চোখের কোটরে
সে মেখেছে অনন্তের ঝঞ্ঝাবারি, কাটা
ঘুড়ির উল্লাস, তার নখের আঙুলে
বিড়ালের মৎসগন্ধী ছোবলের
তৃষ্ণা ডানা মেলে

দ্যাখো পোষা পাখিটিকে দ্যাখো
চোখে তার ছলচ্ছল জলের প্রপাত
নখে নিয়ে অভ্রভেদী ঘৃণার সম্পাত
সে সাজায় ক্ষুধাহীন উড়ালি নগর

দ্যাখো পোষা পাখিটিকে দ্যাখো

উদ্বেগ

তার নাম হরিণ, হরিণ।
ছুটন্ত রোদের মধ্যে উবু হয়ে জল খায়, তৃষ্ণায়।
বারোটি ফেরেশতা তারা আরশের সুনীল পায়ায়
রজ্জু বেঁধে তার জন্য অপেক্ষায় থাকে।

তার নাম হরিণ, হরিণ।
পেশীতে টংকার তোলে ধনুকের ছিলা
বনের সবুজ ঘাস ঘিরে রাখে তাকে
বহুদূরে বাঘের সুতীক্ষ্ণ নখ ফেরেশতার রজ্জু ধরে থাকে

বীর ও কাপুরুষ

কাপুরুষ একবার মরে, বীরের মরণ হয় বারবার।
সহস্র জীবন তার হাতের মুঠোয়, আর
বেদম খরচ ক'রে সুদ ও মূলের চক্রবৃদ্ধির মুনাফা
বারবার বেঁচে ওঠে সোমত্ত মানুষ।

কাপুরুষ হাভাতে কঞ্জুস তার এক কানাকড়ি
হাটের ভিড়ের মধ্যে নষ্ট ক'রে জটিল জুয়ায়
মৃত্যুর প্রবল হাতে তুলে দিয়ে রাজ্যপাট বাণপ্রস্থে যায়

বীর আসে ঘুরে ঘুরে সহস্র জীবনে
এক শাখা ভেঙে গেলে অন্যতর নবীন শাখায়
বেঁধে দেয় জীবনের ঘুড়ি
কাপুরুষ যুদ্ধে যায় সর্বস্ব সম্বল ক'রে, হারে;
বীরের আস্তিনে গাঁথা শত পরাজয়ের প্রস্তুতি।

আগামী বৈশাখে

ঝাঁ ঝাঁ করে সারাবুক, কোথাও বৃষ্টি হবে আজ রাতে।
আকাশের রাজপথে ঐ শোন মন্দিরার ধ্বনি,

ব্যাকুল বাতাস তার দুই হাতে চাপড়ায় বুক,
গাছের পাতারা কাঁপে হাঁটু জলে ঊর্দ্ধমুখী মাছ।

কখন জানিনা তুমি উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছ জানালায়।
সরল বৃক্ষের বুক তোমাকে ডেকেছে এই শ্রাবণের রাতে;
তার বাহু মানুষের চেয়ে খুব দীর্ঘতর, তাই
তোমার গহীন চুলে আজ ঐ বৃক্ষদের শান্তিময় হাত।

নিবিয়ে দিয়েছ আলো, তোমার চোখের দুই তারা
শ্বাসকষ্টে ঊর্দ্ধমুখী মাছের কানকো হয়ে যায়;
ঝাঁ ঝাঁ করে সারা বুক, বৃষ্টি হবে কোথায় কে জানে।
আমাদের জলহীন জিভে কালো পিপাসার দাগ—
তুমি একফোঁটা জল চেয়ে বৃক্ষদের কপাটে দাঁড়ালে,

একে একে খুলে দিলে শরীরের গন্ধময় সেগুন কপাট,
থরো থরো আলিঙ্গনে শিউরে ওঠে পাতা ও পল্লব,
অসফল অনেক রাতের দুঃখ তুলে নিলো তোমার বল্কল।
আকাশের সরীসৃপ শয়তানের দিকে মৃদু হেসে
ভুলে গেলে আমার এ ঈশ্বরিত বাহুদের প্রেম—
সে-মুহূর্তে দূরের আকাশ ফেটে নেমে এলো অঝোর শ্রাবণ।

আগামী বৈশাখে পাবে কোল জোড়া তোমার সন্তান।

মবিনুর রশীদ

সান্ধ্য ঝড়ে ছায়াশরীর

ওপার থেকে পাতা ঝরার শব্দ এলো
এবার দাঁড়াও। সামনে পথ নেই,
এতক্ষণ হাঁটলে অন্ধকার আগলে
আলো জেবলে দাও। মোগল্ পিদিম
তোমার ঐশ্বর্যের শেষ নিদর্শন।

একটু দাঁড়ান। এই ঝড় এলো
আকাশের গায়ে ঝালরের মেলা বসে।

আরে ছো ;
এখন দুর্বার মাথায় ঝড় আসে,
ক'টা অশ্বত্থ ভাঙে ?
আমাদের তুলসী পাতাও ঝরে না।

হলুদ বিকেলের গা বেয়ে শিরশিরে বাতাস
আদুরে হাতে ছুঁয়ে দিলো ফসলের চিবুক
এমনি সন্ত্রস্ত নগরীর সবাই জ্ঞাত হলো
"কাল দশকের শ্রেষ্ঠ ঝড় গ্যাছে"।

ঝড়েরা কোথায় থাকে ?
কোন আসমানের সিঁড়িতে।
ঘোড়া ছোটা দুরন্ত কৈশোরে কুচ্ছ চিল হয়ে উড়তো
কাদা জলের লুটোপুটিতে ঝড় ছায়া হতো মাথার উপর,
যৌবনে চোখ তুলে দেখলাম
বাঁশের মাথায় দোল খায় ঝড়
এই আঁধারের গা ছুঁয়ে আবিষ্কার করি
আমাদের দুরত্বে তপ্ত বায়ু, ঝড় নাড়া খায়
তাকে ছুঁয়ে ফেলার ইচ্ছেটা মাঝখানে ছড়িয়ে যায় ;

কেঁপে স্থির হয় তড়িৎস্পৃষ্ট বাদুড়ের মত।
এই নিন পিদিম খুব হলুদ আলো দেয়
নশ্বর গা ছুঁয়ে দেখি পিদিমে তেল নেই,
যে শরীর তুমি ধারণ করো আশৈশব
ক্যামন স্থির তার বুকের জমিন,
এতদিন কায়া নিয়ে সুখেই ছিলে—
তোমার কোন শরীর নেই—বাঁকানো হাড়
একলক্ষ হায়েনার হিংস্রতা হয়ে ঝরে,
তুমি তারও অধিকারী নও।
ক্যাসিওপিয়ার নক্সাআঁটা রাতের নীল দেখে
যেই উড়লো সী—গালের ধূসর পালক
সব নীল কালবৈশাখী হয়ে গেল।

ঝড় এলো! ভীষণ পাখা মেলে
আবছা অন্ধকারের বাহন ঝড়,
আমাদের আদলহীন ছায়াশরীরে
কায়ক্লেশে পাড়ি দেয় আপাদমস্তক!

তুমি সর্বময়ী

সেদিক তাকাতেই তুমি হয়ে ওঠো গৌরী
চিবুকে রুপালী ঘাম, দেহে কাশ্মিরী শাড়ী।
তুমি এলেই সূর্যোদয় হয়
ক্যামন নিঃশব্দ কেটে গ্যালো দিন;
বুকের রক্ত ছড়ায় দেহে বর্ণহীন
সময়-অসময়েরা এইখানে কথা কয়।।

আহমেদ হাফিজ

কালো উপাখ্যান

কালো নদীটির কূল জেগে থাকে কালো কালো গ্রামের বাইরে,
কালো নদীটির কালো স্রোত মাতাল বাতাস হয়ে তেড়ে ফুঁড়ে
যায় কালো গ্রামটির দেহ যেন অশরীরী ভয় তীব্র আসে উড়ে
শীতের অসার রাত, কালো নীল হীরে জ্বলে ঘাসের শিশিরে।

চাঁদ নেই—কথা নেই—রূপকথা ছিলো তাও নেই, নিরুদ্দেশ
আশা ছিলো কিনা জানা নেই তা-ও; পুঁথিপোড়ো বুড়োরা নীরব,
অযুত বছর ধরে ভাষা নেই, পড়ে আছে অতীতের শব
মানুষের ঘাম শুষে অপ্রাকৃত ভয়দানো বেঁচে আছে বেশ।

তবে কি মানুষ নেই, একা পড়ে আছে গ্রাম, প্রান্তর বিরাণ!
জবাব দিতেই যেন কেঁদে ওঠে পেটফোলা অভাবের শিশু,
কালো নদীটির তীরে তীরে বসে আছে কিছু চিন্তাক্লিষ্ট যীশু,
গাছের গুঁড়ির চিহ্ন বলে দেয় তারুণ্যের প্রশ্নজীর্ণ প্রাণ।

অথচ সময় ছিলো, যখন সময় ছিলো সূর্যের সময়
একচোখা একদানো পুঁথি থেকে উঠে এসে থামিয়ে দিয়েছে
কালের অমোঘ গতি; তাতেই বাধা নিয়তি, মানুষ বুঝেছে—
কালো আরো কালো হয়, মনের ভেতর দিয়ে মত্ততার বয়।

এমন সময় ছিলো কিছু কিছু ক্ষ্যাপা ছিলো অলিঘুঁজি খুঁজে
খুঁজে পায়নি উত্তর, আকাশের নীলে তাই প্রশ্ন দিত ছুঁড়ে
তাতেই জমতো মেঘ: শ্রাবণের যূথচারী মেঘেদের ভীড়ে
'মানুষ নিয়তি গড়ে', বলতো অশান্ত মেঘ, 'মানুষের কাজে'।

চারিদিকে ফিসফাস, ছায়া ছায়া চাপা ভয়, নির্লজ্জ সময়;
তবু নাকি ভরা থাকে পেট, থাক-না দুপায়ে দাসের শৃঙ্খল—

দানবের দাস হয়ে সময়ের দেশে যাবে জুডাসের দল।
এবং প্রবীণ কারো কারো কীর্ণ মুখ দেখে বুক চমকায়।

কিন্তু সেই যে তরুণ আছে যার এক ক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়
হঠাৎ তা জ্বলে ওঠে—'আমি নিয়ে যাবো'—তার দীপ্র কণ্ঠ বলে
ওঠে—'সূর্যময় দেশে' সময় ঝাঁকুনি খায় তবু তার দলে
ধীরে ধীরে বাড়ে স্রোত। কুঁদুলে বুড়োরা একে একে সায় দেয়।

মানুষের দল ভেলা নিয়ে কালো নদীটির স্রোতে ভেসে পড়ে
ভাটিতে প্রাচীন বন, দুর্গন্ধ এঁটেল পাক, রোগের বাতাস
হিংস্র শ্বাপদ আসে, কিছু কিছু প্রাণ নিয়ে যায় ক্ষয়কাশ
দ্বেষ খুঁজে নেয় কিছু মুচড়ে যাওয়া মন, শ্রম ঘৃণা করে।

ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধীরে রূঢ় অসন্তোষ। জটিল সময়
বনের দীর্ঘতায় ছায়া ফেলে বুকের প্রদীপে, যেন দীর্ঘশ্বাস
ঘন ঘন শোনা যায়, জান্তব বিকার নিয়ে দ্যাখে আশপাশ
মানুষের ভোঁতা চোখ দেখে, তরুণের বুঝি বুক ফেটে যায়।

ঘৃণা? না। এতো তারই রক্ত ওদের জান্তব ধমনীতে বয়
ক্ষোভ? কাদের ওপর? জবাবহীন আক্ষেপে তরুণ গর্জায়
বুক চিরে তার দীপ্র হৃদপিণ্ড মানুষের ভীরু হাতে দেয়
আমাদের হাতে ফিরে আসে সূর্য, ফিরে আসে সূর্যের সময়।

তবু

বহুকাল বাস করা হলো পৃথিবীতে
বহুকাল কথা বলা হলো
বহুচারী এই মৃত পৃথিবীর সাথে
বহু কেলি নীল হয়ে গেল;
চাঁদরঙ প্রেমিকার হিমমাখা ঠোঁটে
ইতিহাস পাহাড়ের তলে
বহুকাল গত হলো রুক্ষ রুদ্র মাঠে
বহু নিশি-ঘোরে আলো জেবলে।

তবু জানি বেঁচে থাকা হয়নি নিষ্ফল
মৃত স্বপ্নের কুমারী সাধ
কাল যদি বলে দেয়, কেন অবিহ্বল—
বুকে বোধের কিংবা অজ্ঞাত
বোধির যন্ত্রণা নিয়ে সোনালী ফসল
কেটে চলে মানুষের হাত।

আমার কাব্য-রমণী

মজ্জার প্রতিটি কণা প্রায়ই দারুণ
অগ্নিরোষে ওঠে জ্বলে, ঘৃণার বাতাস
যখন তখন যক্ষা-রুগ্ন হতশ্বাস
হয়ে কুরে কুরে খায় আমার তরুণ
হৃদপিন্ড, আর মগ্ন দিনের নিবাস
দেখে নিজের ভেতর ক্লান্তির করুণ
ক্লেদে দেহ টানে রুক্ষ প্রতিকূল গুণ।
মন খোঁজে দেহে অন্তহীন পরবাস।

যত্রতত্র মনে হয় বৃথা আস্ফালন—
'সত্য, সত্য' চিৎকার, পরাজিত চোখ
খোঁজে আশ্রয় কলিপতার কনীণিকায়
আমার কাব্য-রমণী যেন হারাধন
খোঁজে তবু—ক্লান্তিহীন—পলাশ, অশোক—
খরা-পোড়া গ্রামে শহরালী ভব্যতায়।

নির্মলেন্দু গুণ

আক্রোশ

নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে
আকাশে উড়িয়ে দেবো।
ঝড়ো হাওয়ায় উড়তে উড়তে আমার টুকরোগুলো
এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে চারদিকে।
অনেক চেষ্টা করেও তোমরা সেই টুকরোগুলোকে
আর আগের মতো সাজাতে পারবে না।

আমার খুব ইচ্ছে হয় ছোটদের খেলনা পুতুল হই।
ছোটরা ভাঙা ভাঙা অংশ জোড়া দিয়ে
হাতি-ঘোড়া-বাঘ তৈরী করতে ভালোবাসে—
এর ভিতর দিয়ে তারা সৃষ্টির আনন্দকে অনুভব করে।
স্রষ্টা হওয়ার আকাঙ্খা মানুষের জন্মগত।
শিশুরা মনে করে বড় হলে তারা
প্রাণবন্ত হাতি-ঘোড়া তৈরী করতে পারবে।
কিন্তু পারে না মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীই
সে তৈরী করতে পারে না—একটি তুচ্ছ পিঁপড়েও না।

তার সাধ যখন তার সাধ্যের সঙ্গে মেলে না, তখন
তার ভেতরে সৃষ্টি হয় প্রচন্ড আক্রোশ—;
সে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে
আকাশে উড়িয়ে দেয়।

তোমরা তাকে চিনতে পারো না, ভাবো বুঝি
মেঘ জমেছে আকাশে।

অলংকৃত অন্তরলোক

সারা শরীর উলঙ্গ প্রায়
কবিতার এক টুকরো কাপড় সারা গায়
সঞ্চয়ে আর কিছু নেই
তোমার চুম্বনও করিনি সঞ্চয়,
দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায়
অনন্তের জিজ্ঞাসা শুধু
আমি কে
আমি কোথায়।
একান্ত ভিক্ষুকের মত ফুটপাথ দিয়ে হাঁটি
হৃদয়ে আমার একশো একটা সোনার সিংহাসন
নির্দ্বিধায় ধুলাতে লুটায়।
অনির্বাণ অহংকারের মত জ্বলে আমার আত্মা,
বিধ্বস্ত লোকালয়েও সে এক
অনিন্দ্য গোলাপ খুঁজে পায়।

দ্বিধাখন্ডিত

দশদিকে ধাবমান দশটি ঘোড়া
অপরূপ অমোঘ আহবানে ভরা
লেজের সাথে তাদের বাঁধা আছে কড়া
আমার দ্বিধান্বিত ধুকপুক হৃদপিন্ড
এবং দশ দিকের পেষণে হচ্ছে খন্ড খন্ড।

পেন্ডুলাম

ছেঁড়া ছেঁড়া মন
ছেঁড়া ছেঁড়া মন

আংশিক মেনেছে বাঁধন, আংশিক মেলেছে পেখম
আংশিক দু'দিকে ধাবমান
যখন তখন।

সসীমেই অসীম

এরচেয়ে বেশী কিছু নেই।
ঘাসের আঁচলে এইটুকু শিশির কণাই
পৃথিবীর শেষ সৌন্দর্য
ওটুকু সংরক্ষণ করে রেখো,
এর থেকে বেশী কিছু নেই পৃথিবীতে।
যতটুকু আসে নৈঃশব্দের গভীর থেকে
ততটুকুই জন্মের পর্যাপ্ত ভ্রূণ।
ওটুকু সংরক্ষণ করে রেখো,
দৃষ্টির মণিতারায় ঐটুকু আলোই
ছুঁয়ে যাবে তমসার তিষ্পান্ন তলা
এই হাত, তার পাঁচটি আঙুল
প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে মেখে নেবে সৌরভরেণু
তাই সংরক্ষণ করে রেখো।
দেখো এটাই মাটির শেষ গর্ভধারণ
শেষ বারের মত ওর গর্ভে জন্ম দাও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান,
পৃথিবীর শেষ সূর্যোদয় থেকে মেখে নাও
ভাষাময় সোনালী আর তার লাল।
যা কিছু আমার পরিপার্শ্ব
আকাশ, মাটি, ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক
এর চেয়ে বেশী কিছু নেই পৃথিবীতে
এরাই জীবনের আদিঅন্তের মানব-মানবী
সংরক্ষিত গুদামঘর।

তুমি আমার মৃত্যুর মতো

তোমাকে আমি কক্ষনো ভালোবাসিনা। তুমি আমার মৃত্যুর মত। জীবনের অমোঘ নিয়তি, জাহাজে বিধ্বস্ত জাহাজের নিরুপায় শেষ আশ্রয়, অতিক্রম

করা যায়না বলেই তোমাকে ভালোবাসতে হয়। তোমাকে কখনো ভালোবাসিনা আমি। হৃদয়ের অন্তিম প্রান্তে অনস্বীকার্য প্রহরায় তোমার আদিগন্ত ব্যাকুল দু'নয়ন, মাঝে মাঝে সমুদ্রের উত্তলতা নিয়ে ঝরে পড়া একবিন্দু শিশির। তোমার কাঁপা কাঁপা চিকন ফর্সা চিবুকে চতুর্দশী চাঁদ অভিমানে অকস্মাৎ অমাবস্যা। তোমার কপালে টিপ না হলে আমার আকাশে একটিও নক্ষত্র ফুটবে না যে, আমি তাই খুব নিরাপ্রয় যেন, আমার মুহূর্ত দিয়ে গড়ে তুলি তোমার প্রতিমা। তোমাকে আমি কক্ষনো ভালোবাসিনা। কিভাবে যেন অন্ধ হয়ে গেলাম, এখন তোমার চোখের আলো ধার করেই আমার পদক্ষেপ প্রচলিত। কিভাবে যেন আমার হৃদস্পন্দন বিপদজনক ছন্দহীন হয়ে গ্যালো; সুতীক্ষ্ণ ছুরি কাঁচির সুনিপুন কারুকার্যতায় তোমার হাতেই হৃদস্পন্দন ফিরে পেল এক নতুন সুর। সেই ঋণ সফেদ পাঁজর হয়ে আমার হৃদয়ের চারিধার, আমার কি সাধ্য বলো, সেই আমারই পাঁজর ভেঙ্গে বদলে দেই হৃদপিন্ডের গতিমুক্তছন্দে। করতল খুলে দেখি হস্তরেখা কই? তোমার চুম্বনের পুরোনো দাগ। একপা পিছালেই এলোমেলো বাতাসে তোমার অগণণ চুলের ধোয়ায় ভয়ানক বিষন্ন আকাশ এই কাঁদবে বলে। একদিন গোলাপের পাঁপড়ি ছুঁয়ে তোমার ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম; একদিন গভীর রাতে জানালা পথে দেখি, রাত্রির শরীরের আঁধার নয়, তোমার চোখের পাঁপড়ির সুসজ্জিত সমাবেশ। কেউ জানেও নি কোনদিন রাতে এ চোখে ঘুম নয়, তুমি নেমে আসো। সমস্ত প্রকৃতিই তোমার পক্ষে প্রতিমা, আমার পক্ষে কেউ নেই, আমার শরীরের সকল কলধ্বনির প্রভু হয়ে বসে আছো একান্ত মস্তিষ্কে আমার; মানবোনা বলে এগুলেই আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, চোখের পাতা পরস্পর লেগে যায়, দারুণ বিরোধ, দুঃখের ভেতর দুঃখের লক্ষ সন্তান ভীষণ কাঁদতে থাকে। নিঃসঙ্গতার ভেতরে রক্তরক্ত লক্ষ পদ্ম ফুটে ওঠে দীঘল দীঘিতে। রক্তের ভেতর হেঁটে বেড়ায় হাজারো মাকড়সা; আর আমার ভালোবাসা প্রবল প্রতিহিংসায় ন্যাংটো ভিখারী হয়ে ফুটপাতে ফুটপাতে ভিক্ষা করে অতঃপর কি করবো আমি, অঞ্জলি ভরে হৃদয়ের সমস্ত সুধা ঢেলে সমর্পিত হই তোমার পদতলে। রোপন করি আমার প্রেমচুম্বন চোখের জলে। বুকে তখনও অমোঘ আর স্বভাবের যুদ্ধ চলে।।

জলরূপী

তুমি তো জলের মত
প্রয়োজনে তুমি জমে যেতে পারো

কখনো গলে গিয়ে বয়ে যেতে পারো অবিরল
মিলিয়ে যেতে পারো বাষ্প হয়ে।

একদিন তুষারের শুভ্রপবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে
পরম ভালবাসায় ধরতে
তুমি জল হয়ে টুপটুপ ঝরে পড়লে।
রোদের কথা বলে
আমার সম্মুখে বাতাসের হাত ধরে মিলিয়ে গেলে
তোমাকে দেখবো বলে নদীর মোহনায়
কী উন্মুখ হয়ে বসে থাকি
তুমি তখন পাহাড়ের মাথায়
বরফ হয়ে জমে থাকো;

তুমি জল;
প্রয়োজন বোধে বদলাতে পারো অবয়ব অবলীলায়
আর আমি অনলের মত
নিজেকে পুড়িয়েই জ্বলি ধিকি ধিকি
হৃদয়ের উত্তাপ আগুনের মতই উষ্ণ
ওতে কোন ছলচাতুরী নেই
বদলে যাবার ক্ষমতা আমার নেই
নিজেকে পুড়িয়েই প্রকাশিত আমি
অতঃপর একবার পুড়ে পুড়ে
ছাই হয়ে
নিভে যাই।

জবাব দাও মোর পূর্বপুরুষ

গোত্রহীন ক্যাকটাস এক
সুক্ষ্মতর শীতল আধিপত্যে লতিয়ে আছে খুব
আমার জীবন অট্টালিকায়
একগুয়ে ক্ষিপ্রতায়।
ক্যাকটাস আমার রক্তের ভেতর
বোধহীন কাঁটা বেঁধায়,

নিষ্প্রভ করে দেয় মগজের সুর্যাভ কোষ
বলোতো এই ক্যাকটাসের জন্ম কোথায় ?
এ শতাব্দীর হাওয়া আমার খোলা বুকে
এ শতাব্দীর আঁধার আমার আমার দু'চোখে
এ শতাব্দীর ক্ষুধা আমার ঐ ঠোটে
এ শতাব্দীর বিপন্ন বাতাসে
বিস্তৃত বিস্তীর্ণতা ক্যাকটাসের বিশালবনে
তারই এক ক্ষুদ্র পরিসরে
জীবনানন্দের পদচিহ্নে আঁকা হয়েছে সীমানা
আমার বাসভূমির
এবং সুধীনের উচ্চারনের ইট দিয়ে
গড়েছি প্রতিটা শক্ত দেয়াল জানালাহীন।
বোদলেয়ারের ফাঁকা চোখের মতন
রেখেছি একটা শূন্যতা শুধু
সেখানে করে ধুধু
আমার পূর্বপুরুষের দীর্ঘনিশ্বাস
খুড়িয়ে চলা কবিতার ফিসফাস।
ওহে মোর পূর্বপুরুষ
তোমরা কি গান অবিরাম
ছড়িয়ে দিয়েছ বাতাসে বাতসে
তোমাদেরই বংশধরের মাঝে মাঝে
তোমাদেরই স্যাঁতস্যাতে ছাঁচ
গড়ে উঠে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
অতঃপর কোন সুর ছড়াবো আমি
পরবর্তীর রক্ষিত আকাশে।

শিহাব সরকার

অন্ধ যেমন

বলার ছিলো অনেক কিছু
কিছুই বলা হলো না
বলতে গিয়ে এখন দেখি
ধ্বসেছে কথার পরগণা !

অন্ধ যেমন আলো খোঁজে
হাতড়ে বেড়াই শব্দ শব্দ
কথায় ধারানো তীর ক'খানা
ভেদ করে যাক এই বঙ্গাব্দ।

শত্রু হলে বিষ মাখাতাম
আমার তীরে ষষ্টি মধু
তবু যে ভয়, কেউ না শেষে
ডেবেই বসে, ডাকাত সাধু !

বলতে গিয়ে হলাম বোবা
কিছুই বলা হলো না
রেখে গেলাম গোলাপী ক্ষত
নৈঃশব্দের যন্ত্রণা।

ফখরুল আহসান

দুঃখ আপন কীর্তন

দুঃখে তার আপন দুঃখ ছিলো, জেনেছিলো সে ধ্রুব মেঘসত্য
স্বপ্নের গগন ফেটে যখন সাদা গোলাপদানী ডাহুক ইশারা
তখন দুলেছিল সমান্তরাল নীল ও টিয়ারঙ পাহাড়,
এবং কখন নত হতে হতে শব্দে তার গলাকাটা গেছে
বুঝতে পারেনি, শীতের সব্জির মতোন তার শিহরণ থেকে
এক ফোঁটা রক্ত যদি বিরহের দরে ঝরে যায়, তবে তা গিয়েছে
ঐ ত্যাগের অনুরাগে জলের পাথরে কবিতা বাসরে।
আবার দুঃখ সেজেছিল এ্যামন সেই পুরানো পোশাকে
যা ক্ষতের ভেতর বাড়িয়ে তোলে আরেক গোলাপী ক্ষত,
হৃদয় বাক্সের ভেতর অনন্তের মণিমুক্তাগুলি কল্পিত
হৃদয়পুরে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ছিঁড়ে গিয়েছিল
সবুজ একটি চঞ্চল রাস্তার মতো, আর সে ভেতরে বাইরে
সবখানে তার শেমারতি গান গেয়ে ব্যথা দুলদুল
কলমীর কোরকে আকণ্ঠ ডুবে ছিলো এই ভেবে—
যদি বিরহের রঙ কলমীর আত্মায় মেশে, তবে
ঐ কলমিও হবে বাংলার ব্যথা জরজর শ্রেষ্ঠ নীলকবি।

কে দ্যায় তোমার নাম শেম

কে দ্যায় তোমার নাম শেম
বলো কে দ্যায় সবুজ ঘাসের বিলাসী বর্ণনা,
শিশির মাঠের গোল গোল চাঁদছায়া
সবুজ লজ্জায় তোমার দেহগ্রন্থি জুড়ে।
কে দ্যায় বুকের ভালোবাসা ছুঁড়ে।
কে দ্যায় তোমার নাম বলো ?
সত্যি হলে তোমার চোখ দিয়ে বলো
মিথ্যে হলে আমাকে তৃষ্ণার মধ্যে ফেলে
পুষ্পনিয়ম তুমি, সবুজ তৃষ্ণা তোমার
ঠোঁটে তুলে নিও, আমাকে লজ্জা দিও।

শেষ, কে দ্যায় এই নাম ?
কাগজের বুকে শিহরণ, ইঙ্গিতে স্বপনের মতো
তোমার মনজুড়ে জাল ফেলে
যে মাছ ধরে রেখেছ, ধরতে পেরেছি কি
আমি সেই প্রেম, শেষ নাম যার !

পশ্চিম

ভালোবাসা ওড়ে পশ্চিম নীলে, ধরতে পারলে ধরো,
টুকরো টুকরো লাল শূন্যতায় হৃদয় থরো থরো।
অস্থির হবে পাখিরাও সবে এই কি বাজীতে লেখা,
কোন পাগলীর বুকের ভেতর ঘুমায় পাগল একা।

ভালোবাসা ওড়ে পশ্চিম নীলে, ধরতে পারলে ধরো
ক্যামন নেশায় নীরব ভূমিতে একটি বাসর গড়ো ?
পালতোলা এক নাও ডোবে আর দুচোখ মনস্তাপে,
ঝড় বয়ে যায়, শুদ্ধ এ ঝড় হৃদয়পত্র কাঁপে।

ভালোবাসা ওড়ে পশ্চিম নীলে, ধরতে পারলে ধরো,
হাতের উপরে বৃষ্টির মতো ভেতরে বাইরে ঝরো
দুঃখগুলো যে মৃণাল মায়ালী সন্ধ্যার ঠোঁটে আঁকা
মেয়ে তুমি যাও, তুমিও ওড়াও বিজয়িনী আঙরাখা।

অপেক্ষার কবিতা

প্রেমের ক্লাস নয় জানি তবু ক্লাস করো;
অপেক্ষা করেনা রোদ্দুর বিকেল চলে আসে—
তখন ঐ মেঘটুকুয় কিইবা বলা, কৃষ্ণচূড়ায় হেলান দিয়ে
কে, সে কে ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই ভালোবাসে ?

অপেক্ষা আসলে প্রতীক্ষার মৃত্যু যন্ত্রণা—
পাখির মতোন তীক্ষ্ম ঠোঁটে হৃদপিন্ড নিয়ে ওড়ে,
তোমার বইপুস্তক আর নির্লজ্জ ক্লাস কি জানে
কে তোমাকে ভেবে ভেবে তীব্র আশায় পোড়ে ?

সৈয়দ শামসুল হক

এখনো তুমি কবি

এখনো তুমি কবি তুমি এখনো বটে কবি
প্রথম দিনের কবি
তুমি সেই বাহান্নোরই কবি
বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে কৃষ্ণচূড়ার নিচে তুমি অপেক্ষমান কবি;
নারীর নয়, অপেক্ষা তো নারীর জন্যে নয়,
অপেক্ষমান তুমি
একটি মিছিল গড়ে উঠবে বড় তোরণের পাশে
সেই মিছিলের সঙ্গে যাবে তুমি;
যেন তুমিই হবে বাংলা ভাষার প্রথম কোনো কবি,
যেন তোমার হাতেই নতুন করে উঠবে ফুটে বাংলাদেশের স্লেটে
অ এবং আ এবং ক এবং খ।
তুমি কোথায় গেলে তুমি ?
কোন বাঁদরে নাচ দেখালো ভিড়লে তাদের দলে,
কোন বাগানে ফুটল কি ফুল দৌড়ুলে সেইখানে;
গেলাশ ভরে নিলে তোমার ভাইয়ের রক্ত তুমি,
পান করলে পাঞ্জাবীদের সাথে,
পাঞ্জাবীতো পোষাক বলেই বরাবরের জানা,
পাঞ্জাবী যে খুনীও হয় তোমার চেয়ে ঐ সময়ে আর কার তা জানা ?
সেই জানা তো জানালে না তোমার ভাইটিকে,
সেই জানা তো জানালে না তোমার বোনটিকে,
মিছিলে গেল তোমারই ভাই তোমারই সেই বোন,
মনে কি পড়ে শ্লোগান শুনে চমকে গেলে তুমি ?
কি আশ্চর্য, এবং তুমি, তুমিই সেই তুমি
একাত্তরে একটি কথাও না বলে আর
একটি গুলি না ছুঁড়েও তো মুক্তিযোদ্ধা হলে;
কবির কপাল বটে,
এবারে স্বাধীন দেশে ঠান্ডা কলের ঘরে তোমার বাসা,
এবার স্বাধীন দেশে পুলিশ ঘেরা সুরক্ষিত তুমি,

সাধ্য বা কার সাক্ষাত পায়,
স্বাধীন দেশের মন্ত্রী এখন তুমি,
তোমার গায়ের জামা নাইবা খাকি হলো তোমার মনটা গাঢ় খাকি;
কে বলবে কবি এবং যুবক এবং ছাত্র এবং
বড় সবুজ বদ্বীপেরই পুত্র ছিলে তুমি,
গায়ে ছিল তোমার পিতার আলিংগনের ভেজা ঘামের ছাপ
এবং কড়ে আঙুলে ছিল মায়ের দাঁতে অশুভনাশের দাগ।
আমরা জানি, যৌবনের আমরা কেবল জানি,
তোমার শোবার ঘরের সংগোপনে
পাশের ছোট টেবিলটিতে
আছে একটা ছবি,
বড় আবছা ছবি,
তোমার তরুণ কালের ছবি,
সেই ছবিতে মুখখানাতে বিশাল দুটো চোখ—
যেন দেখছে মানুষ, দেখছে মিছিল,
দেখছে ইতিহাস।
এখনো বড় ভাবতে ভালো লাগে
একদা তুমি কবিতো ছিলে এখনো তুমি কবি,
নিশান ওড়া তোমার বাড়ির নিজস্ব নীল ঘরে
যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো
তোমার মুখ স্থাপিত থাকে তোমার নারীর পাশে,
একটি হাত একটি স্তনে,
ঠোঁটে সদ্য চুম্বনের এবং কিছু পদ্যাংশের পুরনো কিছু স্মৃতি,
তখন আমার হঠাৎ এমন মনে হয় যে
এখনো তুমি কবি,
তুমি সেই প্রথম দিনের কবি,
সেই যৌবনের কবি,
বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে কৃষ্ণচূড়ার নিচে একা তরুণ কোনো কবি;
কেবল ছোট তফাৎ এই
সেই কবিটি দাঁড়িয়ে নেই
শুয়ে সে আছে লম্বা হয়ে গলিত এক লাশ
চতুর্দিকে মাছির মতো উড়ছে কিছু তারই গোপন ত্রাস।।

ভাগ্যিস আমার অশ্রুগ্রন্থিগুলো হৃৎপিন্ডে

তারও ছিলো কষ্টের বিলাস।
ছিলো দুঃখের বাগানে উর্ধ্ববাহু মানিপ্ল্যান্ট
দুচোখ ভরা ছিলো কাজল দীঘির ম্লান জোৎস্না;
আঙুলের ডগায় ছিলো শিউলিবোঁটার সকালের সাজ।
সারারাত ঘুম পাড়ানিয়া শুনত সে চোখ মেলে,
আর আকাশের নীল পর্দায় দেখা হতো
নক্ষত্রের ঘর সংসার।
দোতালার দুঃখের জানালায় লাল নীল
পাখা মেলত নিয়ন শোভিত রাজপথ।

আমারও ছিলো ভীষণ কষ্টের আঙিনায়
ঝরা পাতার আনন্দ।
বাদামী উত্তাপের সমান্তরালে ছিলো—
তোমার গোলাপ কাঁটা শরীরের ভাঁজ।
আর নীলাভ স্মৃতিতে ছিলো সাগরের
ভেতরের ইতিহাস।
দুহাত ভরা ছিলো ভীষণ দুঃখের দুঃসময়,
আর ছিলো কৃষ্ণ উষ্ণ প্রাণময় রাজপথ।
তাই গোলাপী সময়ে বীতশ্রদ্ধ আমাকে
দেখিওনা কষ্টের ভয়।

ভাগ্যিস আমার অশ্রুগ্রন্থিগুলো হৃৎপিন্ডে
তা নাহলে আরেকটি মহাপ্লাবনের জন্য হয়ত
অপেক্ষা করতে হতো এ পৃথিবীকে।

শিকড় ভেদী তরীন্দাজ

রাতের আকাশ থেকে ক্যাসিওপিয়া
ভোরের বাতাস থেকে বকুলের ঘ্রাণ
আর বিকেলের সোনা হলদে রোদের আদর নিয়ে
রাজপথে নেমে আসা যুবক তার ঘর সাজায়।

ও বাড়ীর উদাস চোখের মেয়ে
স্নান ঘরে লালটবের পামে নখের আঁচড়ে
লেখে ফুলের নাম কাঁপা কাঁপা হাতে
সবুজ বাকল তাতে বাদামী হয়ে
বাড়ায় দুঃখ, ভালবাসার।

ল্যাম্পপোষ্টতলের যুগোল ভিখারী
শূন্য পাত্রের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দেয়
নিদ্রাহীন পরস্পর বিমুখী নির্জন রাত.

অ
  ক
    স্যা
      ৎ

তামাটে পিঠে অক্ষয়তূণ, দক্ষিণহাতে গান্ডীব
আর বাম হাতে কৃষ্ণের বর নিয়ে অপসূয়মান
দীঘল অবয়ব তাদের সুসংবাদ দেয় সময়ের।
রাজপথে নেমে আসা যুবক, ফুলপ্রেমী উদাস মেয়ে
আর নিদ্রাবিমুখ যুগোল ভিখারী
তাতে খুঁজে পায় শিকড়ের খাদ।

অবাধ উচ্চারণের জন্যে আত্মত্যাগ

প্রথম শতক হলো অবাধ এক উচ্চারণের আত্মত্যাগ
স্বাধীনতা—এই ধ্বনি যা জিহবার আন্দোলন থেকে সংক্রমিত
হতে থাকে সমুদ্র স্বরের মতো গ্রাম এবং শহরে
কিন্তু ক্রমাগত রক্তচোখের দেয়ালে বাঁধা পেতে থাকে সেই উচ্চারণ
বিশ শতকেও কারাগার হয়ে ওঠে প্রবঞ্চকদের গবেষণাগার
আর বছরগুলো গড়িয়ে যায় আমার প্রতিরোধপ্রবণ বাহুর মধ্যে
আর হাজার হাজার নক্ষত্রের মতো সম্পাদিত হতে থাকে
আমার দিনপঞ্জীর প্রকাশনা ঃ

যেখানে মৌমাছির গুঞ্জরণ আর ধানশীষের সংবাদ ও বিরল নয়
বিরল নয় নদীর কল্লোল এবং গাঙচিলের চিৎকার, কুয়াশাভেজা
কৃষকের পায়ের শব্দ, বন্দী পিতার জন্যে অপেক্ষাতুর শিশুর চোখের জলের
নিরবিচ্ছিন্ন অনুবাদ, সম্রাটদের পলায়ন,
মুদি দোকানীর হাঁকডাক কিংবা শেয়ার বাজারের ওঠানামা ও

দ্বিতীয় শতক হলো বিজয় সাফল্যে ভরা সৌন্দর্যের আন্দোলন
সৌন্দর্য অর্থাৎ বসন্তের উৎসর্গপত্রে লেখা ভালোবাসা
যারা ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নেবার দায় থেকে মুক্তিযুদ্ধের
ওয়াগানে চড়ে তারা এশিয়ার উপকূলে সূর্যাস্তের জলন্ত
কয়লার সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করুক গুপ্ত শিকারীর সতর্কতা
দেখুক অন্ধকারের জন্য বেড়ালের চোখের আগুন অথবা পাঠ করুক
কার তুষারের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আমার কবিতা

তৃতীয় শতক হলো খুব এক শপথের হীরে বসানো মুকুট খুঁজতে
বেরিয়ে পড়া; সোনালী লতার চুমকি বসানো পথে ট্রাফিক খরগোশের
সিগনাল সরিয়ে কাঠ বিড়ালীর মতো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে
অনুসন্ধান, আর তার জন্যে চাই তিতুমীর কিংবা
ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ—যাদের স্বচ্ছতোয়া চোখের ভেতর
সমগ্র ভারতবর্ষ স্নান সেরে শুদ্ধ হতে পারে,
সত্যিকার অর্থে তৃতীয় শতকই হলো জরদগব উত্তরাধিকার

জ্বলন্ত জেরোনিয়ামের মতো উজ্জ্বল সারাৎসার
তামা দস্তা রুপো আর ইস্পাতের পাতে তৈরী ফুসফুসের
মৌচাকে ঘিরে আবর্তিত শর্তসমূহ একবার বিশেষে
এবং আরেকবার বিশেষণে রূপ বদল করেই আমাদের পথ পেরুতে হবে
প্রস্তুতি নিতে হবে পিঁপড়ের নিঃশব্দ যাত্রার মতো, আমার বিশ্বাস
সোনা বাঁধানো মুকুটি পাওয়া যাবে কোনো উঁইঢিবি
অথবা ইদুরের গর্তের মধ্যে এবং তখন সময় থাকবে
স্বাস্থ্য পান করার মতো এক আশ্চর্য গোলাপী ঋতু-বসন্ত।

একটি বালক এবং পাখির গল্প

সারাদিন একটি পাখির খোঁজে বালকটি
ঢুকে পড়েছিলো আমাদের শহরের প্রধান ফটকে।
একজন উর্দিপরা টুপিওয়ালা পুলিশকে দেখে সে
জানতে চাইলো ঃ তোমার মতোই ঝুঁটি আছে
আমার পাখিটির মাথার ওপরে; তালের শাসের
মতো চোখ, পাতার সবুজ লেগে ঠোঁট দুটো
সবুজইতো লাগে আর ডানায় ফুলের গন্ধ—দেখেছো
পাখিটি ? মনে হলো উড়তে উড়তে এদিকেই
এসেছে সে, কোথায় যে গেলো !
উর্দিপরা জোয়ান সিপাহী ভীষণ বিরক্ত হলো—
বেটা কই থাকো, এইখানে পাখি, পাখি কি
মানুষ যে খবর রাখবো ?
সরল অবাক চোখে বালক বললো ঃ কেনো
মানুষের চেয়ে পাখিই বা কম কিসে, তিনবারই
খেতে চায়, ক্ষুধা পেলে মানুষের মতোই চেঁচায়,
দিগন্ত ফুটো করে ওড়ার স্বপ্ন দেখে এবং
রাত্রি এলে দারুণ ঘুমায়।
সান্ত্রী তারস্বরে ধমকে উঠলো ঃ যাও
এখানে পাখি টাখি কিছু নেই যাও...

বালক শহরের প্রশস্ত পথ ধরে হাঁটতে
থাকলো—, একটি বাড়ির নীলাভ গ্রীল
ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নারী; রাজকন্যা

নাকি ? বালকটি একটু জোরেই জানতে চাইলো
ঃ আচ্ছা, আমার একটি পোষা পাখি ছিলো
উড়ে গেছে, দেখেছো এদিকে ?
পাখি ? হেসে উঠলো রমণী ; হাওয়ায়
পাতার মতো দু'ঠোঁট দুলিয়ে বললো ঃ আমিইতো
পাখি।
তুমি পাখি, তাহলে তোমার ঠোঁটের রং গাঢ়
সবুজ নয় কেনো, তোমার পিঠের 'পরে
সোনালী পালক কই, বুকের নিচেয় শরত
মেঘের মতো নরম কোমল রোম কই ?

রমণীটি ভীষণ লজ্জায় মেঘের ভেতরে পালালো।
নিরাশ ক্লান্ত চোখে বালকটি হাঁটতে হাঁটতে
নগরের মাঝখানে ট্রাফিক সিগনালের কাছে
এসে থমকে দাঁড়ালো। ঐযে কাশ ফুলের মতো
সাদা পোশাকের দীর্ঘ লোকটি, সে নিশ্চয়
জানে আমার পাখির সংবাদ, বালক ভাবলো।
সে চাইলো ছুটে যেতে নাগরিক আইন
অমান্য করে ট্রাফিকের কাছে—হা হতোস্মি
তাকে বাঁচাতে গিয়ে কয়েকটি দ্রুতযান নিয়ন্ত্রণ
হারালো এবং দু'জন অ রোহী নিহত হলো, আহত
অনেক।

কে এই সংঘর্ষের হোতা ? মেট্রোপলিটন
পুলিশ বললো ঃ ঐ যে অবাধ্য বালক ট্রাফিক
সিগনাল অমান্য করে নগরের আভিজাত্যে
আগুন ধরিয়ে দিলো, ওকে দণ্ডাদেশ দিতে হবে।

বালকটি এসবের কিছুই বুঝলো না, শুনলো একটি
ভ্যানের শব্দ আর নিজেকে দেখলো পাখির
খাঁচার মতো অসংখ্য লোহার শিকের ভেতরে।
বালক ভাবলো-তাহলে যে সারাদিন পাখির
সন্ধান করে বন্দী হয় লোহার খাঁচায় সেই
তবে পাখি ?

মুখোশ

নশ্বরতার গন্ধে বিষপিঁপড়ে উঠে আসে দেহে
নখ থেকে চুলে, চুল থেকে অন্য কোনো প্রত্যঙ্গ পথে
সব কিছু সহ্য করি বৃক্ষের বাকল
সহ্য করি মানুষের উপেক্ষার ভাষা
পিঁপড়ের পিপাসা নিয়ে প্রেম
সহ্য করি ঘৃণ্য ঘুণে পোকাদের পৃষ্ঠপোষকতা
আমার স্বপ্নের পথে অন্ধ সহিসের হিস্ হিস্ তাও সহ্য করি
মূলতঃ মৃত্যুকে দেখে
মূলতঃ মৃত্যুর চেয়েও কোনো মগ্ন মৃত্যু দেখে
সহ্য গুণে শামুক হয়েছি

এইসব হলাহল রুগ্ন রাজনীতি
সার্বভৌম সংগঠন সমিতি আর
প্রতিষ্ঠান প্রিয় মানুষের পাশে থেকে রৌদ্র হারিয়েছি
ভুলে গেছি রাস্তায় বেরুলে রাতে জ্যোৎস্না পাওয়া যায়
ভুলে গেছি মানুষের ভেতরে এখনো
দু'একটি অসীম মানুষ জেগে আছে
যারা মুখোশের গন্ধে আজো বমি করে

এলিজি

আমার মৃতদেহ যারা বহন করে চলেছে
গতকালও তাদের ঈর্ষার জ্যামিতি থেকে
বেরিয়ে এসেছিলো ত্রিভুজ কুঠার
তারা সর্বদাই আমার ছায়ার ওপরে
নৃশংস কুঠার চালাতো
আর আহত বাতাসের চোখ থেকে
গড়িয়ে পড়তো গিটারের কান্না
বৃষ্টির বিলাপের মতো সেই কান্না
আমার বহু ব্যবহৃত স্মৃতিতে আগুন ধরিয়ে দিতো
ছুটে আসতো দশলক্ষ হাওয়ার ক্ষুরধ্বনি
কেননা ঐ হাওয়া আমার শ্বাসযন্ত্রের সহযাত্রী ছিলো

বজ্রের অট্টহাসি দেবদূতের চাবুকের মতো
শব্দ করে উঠতো
কেননা ঐ আকাশের মেঘপুঞ্জ ছিলো আমার অন্তরব্যাপী
যে দেয়ালের ভেতরে ওরা আমার ছায়া হত্যার
নীল নক্‌শা আঁকতো
সেই দেয়াল থেকে ছুটে আসতো
প্রতিধ্বনির অদৃশ্য ভল্ল
কেননা ঐ দেয়াল ছিলো আমার অতিক্রমণের
অনিবার্য লক্ষ্য

আমার মৃতদেহ যারা বহন করে চলেছে
গতকালও তাদের কণ্ঠের স্বরধ্বনি ছিলো
অপবাদের বিষ মাখানো বাণ
কিন্তু এখন তারা বাঁশির করুণতম বিষাদ গীতিতে
ডুবে যাচ্ছে, যেনো এদের সাথেই আমি
খুব কড়া জ্যোৎস্নায় পান করেছি চাঁদ
আর আনন্দে গড়াগড়ি দিয়েছি ধুলোর মধ্যে
কিংবা রেস্তোরার টেবিলে যেনো ওরাই ছিলো
সমাদরনীয় স্বজন
হায়, এইসব প্রবঞ্চকদের পক্ষ থেকে
যখন আমি সমাধিস্থ হবো এবং ওরা
পরক্ষণে হাত ধুয়ে ফেলবে স্বস্তির জলে
এবং এমন ভাবে আমার বুক ঢেকে দেবে
পাথরে যেনো অপ্রতিরোধ্য কবরখানা থেকে
বেরিয়ে না আসি
যেনো প্রতিযোগিতাহীন হওয়া গেলো
যেনো বিনা যুদ্ধে রাজ্য পাওয়া গেলো
আর আমার জন্যে প্রকৃত কান্নারতদের
এমনভাবে সান্তনা দেবে—যেনো আমি আবার
ফিরে আসবো

আমি ফিরে আসবো এই ভয়ে ওরা প্রতিরাতে
আমার কবরে গিয়ে লুকিয়ে দেখবে—
এপিটাফ ফুঁড়ে কোনো উদ্ভিদ জন্মালো কিনা

রেজাউল ইসলাম রাসেল

সমুদ্রে

সমুদ্রের
অতিদূর বেয়ে আসা ঢেউ
আছড়ে পড়ে শরীরে
জলে ভিজে যায় সমস্ত শরীর
তোমার জলে ভেজা শরীর
বেয়ে ওঠে ঢেউ সমুদ্রের;
আশ্চর্য, এত কাছে তুমি!

অথচ সমুদ্রে তো আমি একা
একাকী সমুদ্র, নিঃসঙ্গ আমি।

হাসপাতাল

শুধু বিদ্ধই হচ্ছি
একটা ক্ষীণ যন্ত্রণা মস্তিষ্কে, মনে হয়
আশপাশ কিছুই লাগেছেনা ভালো
ক্যামন অসংলগ্ন, প্রাণহীন, আনন্দহীন
এই আবদ্ধ পরিসর
এখানে নিশ্চুপতা, নিস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতা
শুধু বিদ্ধই করে
দেখি অন্ধকার খাদে পতিত না হলে
ঈশ্বর প্রার্থিত হয় না
তেমনি প্রাণেরা হয়ে ওঠে দুর্বল
স্বপ্নও কি নিষ্ঠুর
কুরে কুরে নিঃশেষিত করতে চায়।

তবুও কামনার গায়ক অস্তিত্বের ভেতর
নিষ্কৃতি চায়, নিষ্কৃতি চায়।
সর্বাঙ্গ চীৎকার করে বলে মুক্তির কথা
বাঁচবার আলো ওঁতপেতে অপেক্ষা করে দীর্ঘরাত।

হুমায়ুন আজাদ

বন্যা ১৯৮৮

কিছু কিছু ভয়ংকরের জন্যে আমার মোহ আছে।
এমনকি ভালোবাসাও রয়েছে। ঝড়, দাবানল, বজ্রবিদ্যুৎ
আমাকে মোহিত করে। আমি মনে মনে এসবের
স্তব ক'রে থাকি। বন্যা আমার প্রাকৃতিক দেবতাদের একজন।
বন্যার কথা ভাবতেই এক প্রচন্ড-বিশাল-মহৎ-
সুন্দরের স্রোত আমাকে প্লাবিত-আচ্ছন্ন করে; আমি তার
আদিম ঐশ্বর্যে খড়কুটোর মতো ভেসে যাই। নুহের প্লাবনের গল্প
আমি প্রথম যখন শুনেছিলাম, আমার তখন
খুব ইচ্ছে হয়েছিলো ওই প্লাবনের সাথে ভেসে যেতে। আমি যদি
তখন থাকতাম, তাহলে নুহের নৌকোয় উঠতে
অনিচ্ছা প্রকাশ করতাম। ছেলেবেলায় একবার বন্যা দেখেছিলাম—
যেনো মাটি আর বস্তু আর মানুষের আশ্চর্য স্বাদ
পেয়েছে জলের জিভ, এমনভাবেই বাড়ছিলো জলের প্রবল সত্তা।
আমাদের বাড়িতে পানি উঠলো, আমরা ঘরে
উঠলাম। তারপর ঘোলা জল ঘরে উঠলো, আমরা খাটে
উঠলাম। বুক জুড়ে ভয়, কিন্তু ভয়ের মধ্যেই আমি জলের রূপের
দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর মুগ্ধ হলাম। তারপর ছোট্ট নৌকো
নিয়ে কতো দিন ভেসে গেছি বন্যার জলে।
আমাদের কাজের যে মেয়েটিকে একদিন আমি ওই জলের দিকে
এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিলো ও এখনি
ঝাঁপিয়ে পড়বে ঢেউয়ের বুকের ওপর। চারদিকে মানবিক
অসহায়ত্বের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিলো আশ্চর্য
অসহ্য সুন্দর। আটাশির এই প্রচন্ড বন্যায় ভাসছে বাড়ি, ঘর,
পশু ও মানুষ। জলের কি দোষ আছে? জলের শুধু স্বভাব
রয়েছে। জলকে যেতেই হবে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রযাত্রায় জল কোনো
বাধাই মানে না। ওই শক্তিমান সহজেই তৈরি করতে পারে
পথ, শহরকে রূপান্তরিত করতে পারে থইথই সাগরে।
তাইতো তার পথ আজ কৃষকের কুঁড়েঘর, ধনীর দোতলা, পৌরসভা,

ঝকমকে শহর, আর তথাকথিত তিলোত্তমা রাজধানী।
বন্যা কি শত্রু ? যে-বন্যা হানা দেয় গুলশান, বারিধারা আর
উত্তর পাড়ায় তাকে কি শত্রু ভাবা যায় ?
একাত্তরে একবার আশ্চর্য বন্যা এসেছিলো, ওই বন্যায় ভেসে
গিয়েছিলো পাকিস্তান নামক একটা নোংরা বাঁধ।
আটাশির বন্যা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে এক গভীর বন্যার
কথা। বন্যা এলে হেলিকপ্টার ওড়ে, কিন্তু আজ
এমন একটা প্রবল বন্যা দরকার যাতে বাঙলার মাটিতে কোনো
এক নায়কের হেলিকপ্টার নামতে না পারে।
পানি কোথা থেকে এসেছে, তা নিয়ে বেশ তর্ক হচ্ছে আজকাল--
নষ্ট রাজনীতিক আর পচা পানিবিশেষজ্ঞরা
এরই মাঝে ঘোলা ক'রে ফেলেছে বন্যার বিস্তৃত জল। কেউ বলে,
পানি ভারত থেকে, হিমালয় থেকে এসেছে, কেউ আবার
পানির ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়। হিমালয়, অত্যন্ত দূরে,
এ জন্যে আমার খুবই দুঃখ হয়। আমার তো মনে হয়, এখনি
আমাদের দরকার একটা একান্ত নিজস্ব হিমালয়।
পরদেশী প্লাবনে নয়, আমরা নিজদেশী প্লাবনে ভাসতে চাই।
আমাদের হিমালয় নেই ব'লে আমাদের এখনি
সৃষ্টি করা দরকার একটা নিজস্ব হিমালয়—সেটাতে আর প্লাবনের
অনন্ত উৎস। কোথায় পাবো সেই হিমালয় ?
আমি স্বপ্ন দেখি—দশকোটি বাঙালি কঠিন বরফের মতো জ'মে
গ'ড়ে তুলছে একটি বিশাল বঙ্গীয় হিমালয়। একদিন
বরফ গলতে শুরু করবে সেই গণ হিমালয়ের চূড়োয়, প্রবল বর্ষণ
শুরু হবে পাদদেশে। গণ হিমালয়ের গণ বন্যায়
ভাসবে গ্রাম, উপজেলা, শহরের রাজধানী, খড়ের কুটোর মতো
ভেসে যাবে শিরস্ত্রাণ, রাষ্ট্রধর্ম, জলপাইরঙ,
সাজানো তোরণ, সচিবালয়, শুয়োরের ঘৃণ্য খোঁয়াড়।
প্লাবনের ভেতর থেকে জেগে উঠবে বাঙলাদেশ ঃ
পলিমাটির ওপর বাতাসে থরোথরো ধানের অংকুর।

সমুদ্র স্বপ্ন

সমুদ্র তটে অস্তির নিঃসীম অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে দেখলাম
সমুদ্র ফেনা থেকে গড়ে ওঠে এলে
আশরীর নগ্ন প্রেমের দেবী
গলনালীর লবণাক্তহ্রদ থেকে
বিকারগ্রস্ত ফিরে দেখি
শরীর বেয়ে নামছে তোমার লবণাক্ত জল।
লবেজান চিত্রকল্পের দিকে
হাত বাড়িয়ে বলি 'হাত দাও হাতে'
নির্দয় আর্দ্র সাগ্রিক তুমি বললে,
'সমুদ্রের চাবি কেন চাও অক্ষমতা'
তবু নিবীর্য পিদিম জেলে বলি,
'বুকে বুক দাও, শরীরে, শরীর শরীরী আঘ্রাণ'
অথচ কী শান্ত ডলফিন শরীর তুমি বললে
'কেন চাও সমুদ্র হৃদয় ?
কেন আকাশী নীল, মহুয়ার ঘ্রাণ ?'
'কী দেবে অসহায় জ্বলন্ত অগ্নিকে তবে ?
তুমি যে নুহের প্লাবণ
ভাসিয়ে ভাসাও আমাকে ধ্বংসালী সুন্দর।'
'হায়রে স্মৃতি থেকো, কালরাতে কোবরা দংশন
করে বলোনি কি তুমি আশরীর বিষ
মেরুর সাদা ঠাণ্ডার ভিতর যখন আমি চিতার আগুন
যদি চাও অসহ্য সুন্দর দেবো সেই বিষ, সেই বিষ।'
'সেই বিষ
তবে তাই দাও'
লবনাক্ত নগ্ন সুন্দরের পায়ের কাছে
লুটিয়ে আছে হেমন্তক্লান্তি, বিষে নীল মৃত্যুতে
দারুণ চিত্রকল্প হতো
আহা, মরণের পর যদি একবার বাঁচা যেত !

নভেম্বরী আগুন

অতীব স্তব্ধ নগরীর পথ, কার্ফ্যু হয়েছে জারি

যে পথে যোদ্ধা মুখর শ্লোগানে হাঁটে
সুদীপ্ত পায় সেখানে উড়ে কি অতৃপ্ত শুকসারী ?
নকশা আঁকা ডানায় শান্ত খেপাটে
তরুণ যেমন মেলেছিলো চোখ নভেম্বরী বাতাসে
তার নিঃশ্বাস ঝরে রাজপথে ! নাকি
ঝাঁঝিরা বুকের তপ্ত রক্ত ভ্যাম্পায়ারের ত্রাসে
অসহায় ঢালে জলপাই রঙা সাকী !
কোন বিনাশীর ঝলকানো খর বুলেট জীবন করে
পান ? জানে কি নগরী মন--
কত অসহায় লাশ পড়ে থাকে নিঝুম কবরে !
সে পয়মন্ত লাশের গূঢ় দাফন
দেখে প্রেতায়িত ছায় কারো বুকে যদি বিদ্যুৎ খেলে
যায় তবে তার যৌবনাকাশে শকুন
ভাসে বারেবার ; আর বিষাক্ত মৃত্যুনেশী হেঁশেলে
সাধের জীবন হয় প্রত্যহ খুন।

আরো কি নেবে বেশরম লাশ নভেম্বরী আগুন !

মিছিলীর চোখ

রাজপথে মিছিলীর চোখে চোখে
নেই আগুন মোহন প্লেবয়
প্রাচীন সন্তের মতো বসে থাকে
প্রেম দিয়েছে মানসী হৃদয় !

কলুর বলদ হয়ে ঘোরে শুধু,
হৃদয়িনীর অতলান্ত স্রোতে
স্বপ্নভুক মরীচিকা ভ্রষ্ট যাদু
কেড়েছে সুখ নিষ্কণ্টক রাতে !

দুঃখহর দ্বৈতরথ

কত বয়স তোমার ! দিতে চাও ঝাঁপ
সভ্য আগুনে ফিনিক্স পাখির সত্তায়
অথবা র‍্যাটল সাপ মেধার খরায়
অসহায় নিবে বুনে ; বিষণ্ণ সংলাপ
বুকে নিয়ে পার হয় মানুষ মানুষে
আর নিত্য খুঁটে খায় রক্তাক্ত শিথিল
পৃথিবীর মাংস। হায় বোকা ইস্রাফিল
কর্মচ্যুত রাখে চোখ অশান্ত বিনাশে।

যদি পারো রুয়ে দিও শান্তির পতাকা
অশান্ত যোদ্ধার চোখে কিংবা রোষমাখা
অগ্নি জেবুলে দেশ ব্যাপী পুড়িয়ো আঙরাখা
নষ্ট কীটের। প্রেমের দেবী হোক আঁকা
অতঃপর করতলে ; শুধু জন্মাভাবী
সঙ্গম ভুলে উড়াও জীবনের দাবী।

উপদ্রুত রমণ

দুর্বল বৃক্ষের মতো তার ঘেরে আশরীর বন্দী
হলাম এই ভেবে যে বেহায়া মন্ডপে খিন্ন নান্দী
পাঠ করবো না আর, সময়ের সুতো অসহায়
দেবোনা ছেড়ে ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে ভুলোমন
বালকের মতো, কিংবা মিছেই তুলবোনা সভায়
তুমুল করতালি। যে দুঃসাহসী রমণে ভ্রমন
করে বিপন্ন প্রসাদ নেবো তারই অঞ্জলী ভরে
দেবো তাঁরার সুবাস বেঁধে নিয়ে যুগ্ম বাহুডোরে।

রুগ্ন জঠরে অনেক আগেই নিয়েছি তুলে কোন
ভুল, কোন সে ছোরায় হৃদপিন্ড করেছি বিক্ষত,
কোন মৃত জোৎস্নায় হয়েছি রোজ রক্তাক্ত খুন
কোন সে রক্ত বন্যায় আজকে নিজেই উপদ্রুত
ওরে তোরা মেলিসনে ডানা রমণীয় আখড়ায়
তুলেনে রক্তপলাশ, জ্বলন্ত ভূমি শিড়দাঁড়ায়।

বেহুলা বিশ্বাস

মানুষ যে বিস্ময় বড়ো, আজো তার
সুন্দরী চিদাকাশে ভাসে
বেহুলার দুরন্ত বিশ্বাস। যার
হৃদভূমি ডুবেছে হতাশে
শালিখের রক্ত সে করে পান এই
অবেলায়! নাকি উদভ্রান্ত
জপে যায় মানসীর আশাহত সেই
পূজারীর নাম অক্লান্ত।
বেদনার দারু বুকে তুলে নিয়ে পোড়ে
নিঃসঙ্গ মাতাল। ক্লীন্ন
বাতাসে যে রকম ধড়িবাজ উড়ে
লোভী চিল, আর্ত প্রসন্ন
ডানায় দু'চোখে নিয়ে রাজ্যের শোক
সে তাকেই দিতে চাও তুমি
মাংসল হৃদয়ের বাণী! হৃদভুক
বাঁধবে না স্বপ্ন রেশমী
অঙ্গনে; জেনেওবা কেন ছোঁও ক্রুশ?
ঘোরলাগা অমানুষ আজো
তাই জলে ডুবে পায় দুর্যোগে হুঁশ
ভালোবাসা হয়নি অকেজো।

দুঃখের নীল সুতো

হঠাৎ করে মিশে গেলে মেঘের ভিতর চাঁদ
পদ্ম তবু জন্মে ঝিলে হৃদয় ভরে ফাঁদ!
শুশুক মাছের মত কেন শুধু দ্যাখো সবুজ
প্রেমের মাঝে প্রেমিক চেনো নারী মানেই অবুঝ!
হারিয়ে যাবে শঙ্খচিল আকাশ বেয়ে জানো
তবুও তাকে দুঃখের নীল সুতোয় বাঁধো ক্যানো!

এক জীবন যদি এভাবেই কাটে

(আসাদ মাহমুদ সুহৃদ প্রতিমেষু)

বৃক্ষশিশুর মতোন প্রথম আলোয়, তুলেছ মুখে
লজ্জাব্রীড়ার লাল ভালোবাসা, কেন
তবু আমি ছোরা নিয়ে দুই হাতে স্থির করি পোড়াবুকে
নিশানা ! নিপুণ ব্যধের মতোই পুনঃ
আগ্রাসন যে করে সেই তুলে নেয় তৃষ্ণিকা শ্বাস ;
পৃথিবীর মেয়ে জানোকি ভয়াল ফাঁদ
আছে মানুষের মনে, রহস্য থাকে যতোদিন আশ
মেটেনা কিছুতে। ভালোবাসা বিস্বাদ
হয় অতঃপর শরীরী ভ্রমনে ঃ মাঝবয়সী প্রমিলা
বুকের ন্যাতানো ভালোবাসা উপবাসী
থাকে গূঢ় রাত এবং দৃষ্টরজা সেই দুঃশীলা
রমনীর মতো কড়িকাঠে দ্যায় ফাঁসী।

পৃথিবীর মেয়ে তোমার হৃদয় থেকে নেবো ঝাড়বাতি
রক্তপলাশ, আকাশে মেলানো গান
সমুদ্ররূপ উত্তাল হোক হেম ভালোবাসা, রতি
বিহীন ঝরুক অতৃপ্ত এ প্রাণ।

দুর্গেশনন্দিনী

ওগো নন্দিনী
ক্যানো বন্দিনী
দুর্গের প্রাকারে ?
জানালায় চোখ
জ্বলিছে কি বুক
প্রেম অধিকারে ?
ভেঙ্গে দাও তালা
জুড়াও এ জ্বালা
কাঁপাও মেদেনী,
দুর্গেরো রানী
তুমি দেবযানী
দুর্গেশনন্দিনী।

নই অর্জুন কোন

আমার শূন্য বুকের কন্দরে নেই ভীড়
অনেক দিন।
নেই কোন দামামা। নেই,
সে নেই।
আমি একাকী এই বিজনে
যুদ্ধবাজ হয়েই গেলাম ভালবাসার
প্রিয় প্রলোভনে।
প্রঘোষিত মরু সৈনিক নির্জনে।
আমি তো নই অর্জুন কোন দেব আশীর্বাদে,
বিনা বিবাদে
লুটিয়ে দেব দ্রৌপদীকে পাঁচভাগে।
তোমার সূচাগ্র ভূমিও আমি দেবো না
যুদ্ধ বিনা,
দেখব ডর করতে পিস্তল পারে কে কত কার আগে
তোমাকে সম্যক চাই—
যেখানে শুধুমাত্র নিজের প্রতিফলন
হোক তাতে নীচ খাদে হঠাৎ পদস্খলন।
নেই কোন মোহ করতে বীজ বপণ
দখলদার বাহিনীর সর্বস্ব সেনাপতি আমি
করব দখল হৃত-সিংহাসন
অতঃপর উড়ুক পতাকা
যুদ্ধ হোক মিত্র
বলব, "দাও একমুঠো অসুখী ভালোবাসা
যা প্রকৃত সাইক্লোন ঝড়, অসম্ভব কীর্তিনাশা।"

হেলাল হাফিজ

অচল প্রেমের পদ্য

১

যুক্তি যখন আবেগের কাছে অকাতরে পর্যুদস্ত হতে থাকে,
কবি কিংবা যে কোনো আধুনিক মানুষের কাছে
সেইটে বোধ করি সবচেয়ে বেশি সংকোচ আর সংকটের সময়।

হয়তো এখন আমি তেমনি এক নিয়ন্ত্রণহীন
নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি,
নইলে এতোদিনে তোমাকে একটি চিঠিও লিখতে না পারার
কষ্ট কি আমারই কম!

মনে হয় মরণের পাখা গজিয়েছে।

২

ভালোবেসেই নাম দিয়েছি 'তনা'
মন না দিলে
ছোবল দিও তুলে বিষের ফণা।

৩

যতোটুকু শারীরিক ততোধিক না হলে হৃদয়
ভালোবাসা হয় ব্যর্থ হয়,
প্রেম যদি কাহিনী হলো তবে কিসের প্রণয়।

৪

এক জীবনের সব হাহাকার বুকে নিয়ে
অভিশাপ তোমাকে দিলাম,—
তুমি সুখী হবে, খুব সুখী হবে।

বেদনা আমাকে নিয়ে আশৈশব খেলেছে তুমুল আর
ছলে ছলে শিখিয়েছে সহনশীলতা,
নিলাজ নখের মতো দুঃখ কেটে কেটে আমি
আজকাল অর্জন করেছি ঠিক উদ্ভিদের অদ্ভুত মৌনতা,
তবু উল্লাসিনী
না জেনে শুনেই কেন দিতে গেলে টোকা।

তুমি আর কী বেদনা দেবে ? কতোটা নাড়াবে ?
পালখিল্য এ খেলায়
আমার চেয়েও বেশি নিজেই হারাবে।

এক জীবনের সব হাহাকার বুকে নিয়ে
অভিশাপ তোমাকে দিলাম—
তুমি সুখী হবে,
ব্রহ্মপুত্রের মেয়ে দেখে নিও খুব সুখী হবে।

৫

হেলা-ফেলা অবহেলা নয়
বিরহে করেছি জয়
মিলনের ক্ষয়।

হায় কিশোরী পাষাণমেয়ে

হায় কিশোরী সবটুকু তার আঘাত দিলি এমন করে,
স্বপ্ন পাগল কিশোর এখন কোথায় যাবে
আগুন হাতে ঘোর ফাগুনে। ত্রিশূল পাথর
বুকের ভেতর সংগোপনে খুব সচেতন
আঁধার ছড়ায় ছন্নছাড়া আঁধার ছড়ায়;
উটকো রকম চিন্তাগুলো
অকালে যার মৃত্যু হলো—সমূল বিনাশ
দগ্ধ পলাশ একত্রিত বানের মত—
মন্ত্র দিতো উজ্জীবনী;
যেমন তোর একটু হাসি ভুল তাকানো
বুকের ভেতর আনতো ফাগুন গভীরভাবে
উঠতো বেজে শীর্ণধ্বনি অন্যরকম
আশার টানে, সেই খানে তুই আঘাত দিলি
পাথর মেয়ে কষ্ট দিলি। বজ্রপাতে
দগ্ধ কিশোর এখন তবে কোথায় যাবে
কোন আধারে ?

সাহসী নাবিকের মৃত্যুতে

সোনালী সূর্য জ্বলে মাথার উপর
যেদিকে তাকাই শুধু ধূ ধূ বালিরাশি; মৃতের
মুখের মত সাদা নিষ্প্রভ
বাদামী ঘাস, পাখির পালক
আন্দোলিত চাবুক ও সহিসের চীৎকার, দূরে
উটের মত মুখ গুঁজে পড়ে আছে সাহসী নাবিক।

"কে যায় কে যায়" বলে
কে যেন ডাকে, হাক দেয়
তখনো অন্ধকার নামেনি পুরোপুরি
চাঁদের আঙ্গুল থেমে আছে পৃথিবীর চুলে।

এক স্বপ্নাচ্ছন্ন যুবক

শীর্ণ ঘন্টাধ্বনি শুনে আমি এক স্বপ্নাচ্ছন্ন যুবক
এসেছি পেরিয়ে ধূ ধূ চৈত্রের মাঠ
চোখে নিয়ে প্রজ্জ্বলিত আশার প্রদীপ,
এলোমেলো ছুটতে ছুটতে
খুলেছি পুরনো পোশাক।

বুকের ভেতর সযত্নে লুকানো ইচ্ছেগুলো
সূর্যের প্রখর ছোঁয়ায় হয়েছে মলিন;
ধুলো বালি আঘাত প্রত্যাঘাতে
শুধু এক শীর্ণ ঘন্টাধ্বনি শুনে
বুনেছি এলোমেলো আকাঙ্খার জাল এতটা বছর।

কে দেবে আমাকে দাও প্রতিশ্রুত পোশাক।

ঈশ্বর ও আমার প্রিয়ার সমাধি

ঈশ্বর আভূমি নত হও,
এখানে আমার এই পায়ের কাছে
একচিলতে মাটিতে সমাধিস্থ আমার ত্রিকাল,
নির্বাণ ও অপরাপর মহাসত্য
ঈশ্বর এখানে তোমাকে হারতেই হবে।

একান্ত নিজস্ব আত্মায় যাকে আমি
সঁপেছিলাম আমার ভূত—ভবিষ্যৎ,
অতিবাহিত ও অনাগত সময়ের ইন্দ্রজাল
অভিশপ্ত কফিনে মুড়ে তাকে ওরা রেখেছে এখানে।

ওরা বলে, এ আমাদের বোধাতীত তোমার গূঢ় মহিমা ?!

দীর্ঘশ্বাসের কাব্য— ১৮

বুকের ভিতরে আছে বীরবাহু শূন্যতার ক্ষত
সেখানে চারণ করে গৃহহারা ফকির লালন
বাউল-পদক্ষেপে শুনি যেন নদীর ভাঙ্গন
ভেঙ্গে যায় বাধাঁবাড়ী মন তবু স্বপ্নে থাকে রত।
যে মন স্বপন দেখে সে মনের মেলেনা আশ্রয়
মুদির দোকান থেকে কেনে সস্তা দীর্ঘশ্বাস
স্বপ্ন মেলেনা গৃহে মেলেনা প্রেমের নির্যাস
বাউল হৃদয় জুড়ে জেগে ওঠে বন্ধনের ভয়।

রাতের গভীরে যেন কে এসে জড়ায় হাত হাতে
ঘুমের ভিতরে আমি অসহায় অন্ধকারে কাঁদি
ফাগুনে বাতাস পেলে মন ছুটে যায় তার সাথে
দেহটাকে তড়িঘড়ি খাঁচার শিকল দিয়ে বাঁধি;
চোখের নদীতে চলে অবিরাম খেয়া পারাপার
মধ্যরাতে পাখী খোঁজে, পৃথিবীতে কে আছে আমার ?

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ছয় লাইন

নিউমার্কেটে সন্ধেবেলা তোমাকে দেখলাম যেন ঘন ভিড়ের ভিতরে;—
তারপরই একটি নদীর মতো তরতর ক'রে অদৃশ্যে মিলালে।

তুমি কী সে-ই, হারিয়ে ফেলেছি যাকে একুশ বছরে,
একথা এখন ভাবি—শব্দহীন এই রাত্রিকালে।

অনন্তকে হাতেই পেয়েছিলাম একদিন স্বপ্নে-ঘুমঘোরে—
১৯৬৪ সালে।

নষ্ট জ্যোৎস্না তিনটি জীবন

আকাশে লটকে আছে বেওয়ারিশ চাঁদ
জীবনের কোলাহল থেমে গেছে
পুরুষ জেনেছে তার জৈবিক স্বাদ !
আলোর রহস্যটুকু মুছে ফেলে
কোন নারী ধরা দিল এ আঁধারে !
কেবল শরীর হয়ে শরীর শরীরে !

বোকা বালিকা । বোঝে নাকো শরীরের ভাষা, গনিকার হাসি,
জানে নাকো প্রেম কত ক্ষুদ্র মেয়াদী।
নষ্ট এ জ্যোৎস্নাকে ভালবেসে
শিহরিত হয় যেন কার আশ্বাসে !
প্রেমময় স্বপ্ন আঁকে হৃদয় আকাশে !

সব জেনে
ভাড় এক, নেশার ভেতর থেকে উঠে এসে—
প্রবল উচ্ছ্বাসে
কেবল হাসে ।।

ছেঁড়া অনুভূতি

আমার সবকিছু কেমন জট বেঁধে যায়
ইদানিং নষ্ট বীজের চাষ হয় আমার মেধায়।
হারাবো না হারাবো না বলে
সবকিছু হারাবার দলে যোগ হলে
হারাবার ভয় লোপ পায় !

আলোর তলে খেলা করে এতোটা আঁধার !
সীমাবদ্ধ জল তার অসীম আকার !
মানুষ কি তবে ঐ জল ? ভুল আলো ?
জীবনের হাতে হাত রেখে মরণকে বেসেছে সে ভালো !

ভুল তুমি কারে বলো এইতো জীবন।
জানো নাকো, বসনের কতটা ভেতরে নারী নারীর মতন !
আমার সবকিছু কেমন জট বেঁধে যায় !
নষ্ট বীজের চাষ হয় আমার মেধায় ।।

ভুল অভিসার

দু'চোখেতে জল ভরে হাতে নিয়ে ফুল কারে খোঁজো ?
নারী তুমি কার কথা ভেবে ভেবে হও অভিমানী !
ভালবাসা ক্ষয়ে যায় খুব অল্পতে এ সত্য বোঝো ?
নারী বলে কেঁদে কেঁদে, "আসবে সে তারে আমি জানি।"
ধীরে সময়ের ঘরে রাত বাড়ে আঁধারে—
নারী তার দু'চোখেতে বুনে যায় নূতন স্বপন !
ফুলের পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে নিথর শরীরে—
নারীর হৃদয়ে শুধু অভিমান করে আলাপন !

আকাশে লুকোনো চাঁদ লুকিয়েছে সব আলো আশা
জোনাকি একাকী জ্বলে তুমুল আগুন নিয়ে বুকে !
মানুষের হয় নাকো অনলকে একা ভালবাসা।
সব ভুলে নারী তাই ঘুমের নেশায় পড়ে ঝুকে।
মুছে গেছে প্রেম ব্যথা জমে থাকা সব অভিমান।
নাগর ফিরেছে তার শরীরেতে গণিকার ঘ্রাণ।।

নদীর ওপারে যাবে

নদীর ওপারে বন, ওপারে সবুজ নীরবতা
বনের মাঝেতে তার একখানা দীঘি কাটা আছে।
সে দীঘির জল যদি পান করি পাবো অমরতা !
প্রেম সুখ সবকিছু ধরা দেবে মানুষের কাছে !
হৃদয়েতে প্রতিদিন গড়ে চলি নূতন ভুবন
অমরতা পেলে তবে শেষ হবে সকল সাধনা।
মরণকে ঝেড়ে ফেলে সাথে নিবো কেবলি জীবন !
বুহতের মাঝে খেলে কুটিলতা, মানুষ জানেনা !

মানুষ অমর হবে ! দেবতার বুকে জাগে ভয়।
বিধাতার পদ খানি টেনে নেয় নিজেদের কোলে !
মহৎ বিধাতা কন্ "মানুষের হবে নাকো জয়।"
নিজের হাতেই তিনি অমৃতে গরল দ্যান ঢেলে !
গরলে চুমুক দিয়ে মানুষ মরণ ভালবাসে !
বিধাতারা হেরে যান মাটির এ মানুষের কাছে।।

মহাদেব সাহা

মানুষ মিলন চায়

মানুষ মিলন চায়, কেউ বিচ্ছেদ চাহে না
বস্তুতঃ মানুষ খুবই বিরহ-কাতর; বিচ্ছেদের তাপজ্বালা
তার মোটে শরীরে সহেনা। অনন্ত বিরহী নেই
বিরহী মানুষ সেও চিরদিন মিলন-উৎসুক;
মানুষের মিলন উৎসব আছে, বিচ্ছেদের শোকসভা নেই
মৃত্যুবার্ষিকীও মিলনেরই স্মৃতি-উদ্‌যাপন।
মানুষ মিলন চায়, বিচ্ছেদের দূরত্ব চাহে না
জড়িয়ে থাকতে খুবই ভালোবাসে মূলত মানুষ,
স্নেহপ্রীতি সৌহার্দ্যের সুখচ্ছায়া তার খুবই চাই
বিষন্নতা চিরদিন মানুষের স্বভাব-বিরোধী।
মানুষ সান্নিধ্য চায়, দূরত্ব চাহে না
তাই যতো মিলনের গান আছে ঠিক ততো শোকগাথা নেই,
এমনকি শোকগাথা সেও মাত্র পুরাতন স্মৃতিকথা শুধু
অনন্ত বিরহ আছে, অনন্ত বিরহী কেউ নেই।

হাসান হাফিজ

অকুণ্ঠিত পদাবলী

তাপমাত্রা
নেমে
যাচ্ছে হিমাংকেরও নিচে
আমাকে
বাঁচিয়ে রাখে
তোমার উষ্ণতা প্রেম গভীর মমতা

মমতা ও ভালোবাসা
মিশে যে দ্রবণ তৈরী হয়
তা এতোটা কার্যকর
আগে সেটা বুঝতে পারিনি !

তোমার সান্নিধ্য তাপ
পেতে আমি নামতে চাই
দূর বহুদূর
গহীন পাতালে

তাপমাত্রা
আরো কমে যাক
তোমার সৌরীয় সখ্য
ছাড়া আর চাই না কিছুই

উপগ্রহ হতেও কুণ্ঠিত নই
ঋণী হতে মোটেও
লজ্জিত নই জেনো।

তাজুল হক

একজন জলধি এবং প্রত্যাষের কবিতা

মোহন বাল্যেই হারিয়েছি সব। জীবনের দায়
এখন ছেড়েছি আমিও। অগ্রজ কারো সায়
ছিলোনা যদিও, তবু
হয়েছি দেশান্তরী সেই বাল্যে। নগর থেকে
নগরে বুথচারী আমার সনির্বন্ধ দৃষ্টি
ছিল মানুষের প্রতি। কঠিন নেশার মেতে
কী দুঃসহ চলেছি পথ অবিশ্রান্ত কোনো সন্তের মত।
কখনো বা বালকের লাল দেখা খুশী চোখে
চমকে উঠেছি
নগরের সজ্জা, মানুষের কোলাহল, অস্ত্রের ঝলক
আর কখনো স্বৈরিণীর চমকে। বিদ্যুল্লতা
গিয়েছিলো খেলে বালকের চোখে।
কখনো বেজায় ঘুরে
বৃক্ষতলে বিশ্রামান্তে পেয়েছি তরুণীর সাক্ষাত।
শ্যামারং সেই সব তরুণীদের নিয়েছিলো
তৃষ্ণ চোখ, যতটুকু পারে।
তাদের বালখিল্য বিহ্বলতা বালককে দিয়েছিলো চলার
খুশি। সবুজ এক বালিকার প্রথম প্রেম
দিয়েছিলো এক নগরে সর্বনাশা
দুই পক্ষ কেটে। মনে পড়ে
যাত্রার এক নিপুণা নটীর সাথে কী সখ্যতায়
একই পালা তার সাতবার নিয়েছিলাম
তন্ময় দেখে। কত গভীর রাতে
বাউলের সুরে নিদ্রা জড়িয়েছিলো শরীরে বৃক্ষমূলে!
কখনও ভুলক্রমে গণিকার গৃহে
করেছি প্রবেশ, ঠোঁটের কামুক চুমু তার
রূপান্তর হয়েছিলো বালকের অধরে পরমস্নেহে।

কৈশোর করেছে প্রবেশ, পথিমধ্যে ; রক্তের
ঝড়োতাপ তুলেছে টঙ্কার
শরীরে ; সাতপুরুষের রক্তবীজ তুলেছে ফণা, ক্ষীপ্র
মোড়সওয়ার কোনো
কেড়েছে মন উত্তপ্ত এরিনায়, চক্রভেদী
তীরন্দাজের তূণের নেশায় কেঁপেছে অস্তিত্ব আমার।
মনে পড়ে কবে কোন
কলতলায়, অপরূপ সেই সাঁঝবেলায়
অষ্টাদশী সীতারাণীর সখীযূথে জলকেলি। হতবুদ্ধি
সেই ঘাতক সন্ধ্যায়
কৈশোরে মিশেছে মাদক ফের, ঢের অবেলায় !
সাতরং অনাবিল মিশেছে অস্তিত্বে
খররোদ্রে কোলাহলময় জনপথে, কখনোবা
চরের লাঠিয়াল দিয়েছে শিক্ষা
জীবনের ; দৈবলোকে ক্রূর রক্তসেচে
মানবের উল্লাস দিয়েছে আরেক চমক। জীবনের
সকল ধাপে দেখেছি শ্বাপদের অধিকার,
বিষ নখরে বিদ্ধ সকল
সৌন্দর্যের আধার আর আমার
জায়মান কৈশোর। বহুরংগা সাপ, ডালকুত্তা
তাড়িয়ে নিয়েছে ক্রমাগত সর্বনাশ থেকে সর্বনাশে
আর বারুদের ধোঁয়ায় আশরীর বিলুপ্ত আমি।
ধমনীর চোরাপথে স্থায়ীবাসী ত্রাস
কখনোবা ক্ষীণ নড়েচড়ে
বেজায় ঘুমেও কিশোরকে দিয়েছে দারুণ ঠকে !
অকস্মাৎ গিয়েছি বোকা বনে। মগজের আঙ্গিনা
রুদ্ধদ্বার, দখল, কাপালিক তান্ডবে।

'ভাগ্যের লিখন হয়না খন্ডন' এমন শ্রুতিতে
বিশ্বাসী নই, তবু যা ঘটেছে আমার
বাল্য ও কৈশোরে

তা এই পৃথিবীর। শোকের
গান, প্রিয় চোখ আর অন্তিম মরুদ্যান আমার
সকল সঞ্চয়। গ্রীষ্মের দুপুরে
টলমল দীঘির জলে, মনে পড়ে, দূরনীলিমা
আর নীলের গানে, কিশোর তার চোখে ধরে
ধীর আনত যুবক। এই
পৃথিবীর জল, মেঘলা বিকেল, অনন্ত রাত্রির
গল্প, ভোরের পাখিডাকা আর তার সমস্ত লীলা
এ পৃথিবীর আদি ও ক্রমাগত ভবিষ্যৎ,
আমার নিজস্ব নিয়তি। কঠিন
ক্রিয়ার অন্তবৃত্তে যুবক
পৃথ্বী দয়িতায়
পুনরায়
বিভোর। ঝলমল কোলাহলে যুবকের ফের প্রবেশ।

বৃষ্টিস্নাত রমনীর শপথ, শপথ
তৃষ্ণার্ত মৃগের, সংসারী টিয়ের, অনাবিল
রক্তদ্রোণের; লাজবতীর রক্তিম শপথ
যুবক তোমার লীলা ছড়াক সকল
জীবে, নদী বিধৌত এ বদ্বীপের সকল প্রাণীতে
উদ্ভিদে দিগন্তে আকাশে, ছড়াক
জনমভর সব গোরখোদকের শূন্য পাঁজরে
শস্যহীন সকল হৃদয়ে, নিঃস্ব শস্যক্ষেতে
বন্ধ্যা ফলের বাগানে, মাছের আবাসে
ছড়াক সমস্ত যুগলের শাণিত শপথে,
গাঙচিলের সংসারে, পথিকের উষ্ণ নিঃশ্বাসে
ফাঁসীর আসামীর উপহাস্য সময়ে, গমগমে
কারখানার চুল্লীর ধোঁয়ায়, নর্তকীর পেশায়
গণিকার বাঁচায়, বাতিল ভালোবাসায়; তোমার
লীলা ছড়াক পদ্মার বুকে, বন্দুকের
সুরুজ নলে, রাজপথের রক্তে, পৃথ্বীর সকল
লীলাব্রতে, এই শাশ্বতগ্রহের সকল চুমায়
লীলা ছড়াক ইহজাগতিকতার সকল শিরায় শিরায়।

অস্তিত্বের গান

দিনরাত্রি খেয়ে প'রে অতীত উচ্ছিষ্ট বেঁচে আছি
কোনো মতে। স্বপ্নের ত্রিসীমা থেকে তাড়িয়েছি মাছি
চৌরঙ্গী সুদিনের সেই মোহন বাল্য থেকে আর
করেছি খুন যত প্রতারক অভীপ্সা বারবার।
কখনো বেজায় ঠেকেও পড়িনি সবান্ধব মন্ত্র
জাতিস্মর দালালদের সাথে মিলিয়ে বাক্‌যন্ত্র;
বরেণ্যে নেতার মতো নামিনি মাঠে, কণ্ঠে শুকনো
ধ্বনি নিয়ে শ্রমিকের সপক্ষে চোখ মেরে কখনো।

বস্তুত, বিনা হাপিত্যেস দুনিয়াদারী ছন্দপ্রাণ
ঠেকে আজো। ফিচেল হাসি দিয়ে অশান্তি বেশুমার
কখনো ছড়ায় কোষে কোষে যদিও নিত্য নেশা
হিসেবে তাড়াই তাকে। কিন্তু কখনো কি হবে পেশা
যদি চরাচরে, সভ্যকুলে দুঃখ আসে দুর্নিবার
নীল আয়োজনে? হবে; প্রেমে আছে অস্তিত্বের টান।

জলভ্রমি

কোথায় আমার যাত্রা; মহাকালের কোন খোড়লে
করব প্রবেশ কিছু না ভেবেই এমন করেছি
শুরু। দু'হাতে সঞ্চয় যত একত্র করে ঘুরেছি
তীর্থতীরে, তবু সেও নিয়েছে কোনো সিদ্ধমোড়লে!
শূন্য হাতে আমি একা দ্বিধাহীন অমৃত গরলে
অবলীলায় দিয়েছি সায়, ক্রমাগত কি পড়েছি
ঢুকে বদ্ধ কোনো কূপে? সান্ধ্যমদে সত্তা খুইয়েছি?
তবুও কোথায় যাবো এ প্রশ্ন মিলায় কলরোলে।

আমার সত্তার সীমানায় নৃত্যপর শত তন্বী
অস্তির গলিতে মাদক জল, বিষণ্ন নর্তকীর
প্রতিক্ষ্যাপা শিস ওঠে যত্রতত্র, কুহেলিকা বহ্নি
পোড়ায় জন্মের সব সংগ্রহের ফল, আবীর
শুধানো অস্তিত্বে লাগে শতাব্দীর বিষসিদ্ধ হেম
আর মৃত উন্মাতাল অনাথ বিশ্বাসশূন্য প্রেম।

যদি বা

এ এক দারুণ বন্দীদশা আমার। অথৈ জলের
অকস্মাৎ স্রোতে জলবন্দী যেন, সব গ্যাছে ভেসে
বানে। আমি নিরন্তর একেলা দগ্ধমরি নিমেষে
সুউচ্চ মাঁচায় আর নিজের প্রতিবিম্বে তলের
ছবিতে আঁতকে উঠি ভীষণ—খিন্নতা সকলের।
কিসের আশায় দিনগুনি হায়, দুঃখ ক্রুর হেসে
করে মিতালি সত্তায়; বলি বেঁচে আছি কষ্টে কেশে।
সৌরভ ছড়ায় নাকে যত গলিত প্রাণ ফলের!

আজীবন এভাবেই কি আমি বন্দীত্বকে করবো
বরণ? নিজেই গেঁথে যাবো নিজের শোকের গাথা?
মলিন দৃষ্টিতে চেয়ে শুষে নেব রূপ সমুহের?
বাঁচার তাগিদ বড় আমার, নিরামিষ ঝরবো
এমন আহ্লাদ বৃথা। সারা জনমের সারকথা—
বন্দীনাশা তরবারী যদি বা ঝলসে ওঠে ফের।

বিনিময় নয় তবু, শপথ

(শাহানা হক বন্ধুবরেষু)

মেয়েটি ভাবতেই পারেনি দৃশ্যটি। নাবিকমতো
এক যুবক চিবুকে
সূর্যের প্রভা নিয়ে ফিরে যাবে দুয়ার থেকে এ ক্যামনতরো
মানবিক! বড় মানবিক বৃক্ষ বিধায়
সে মানতেই পারেনি দৃশ্যটি। ঐশ্বর্য
গ'লে পড়া তার চিবুক, মরুবাসী ঠোঁট, বেসামাল
হৃদয় কখনো পারেনি করতে প্রত্যাখ্যান
তাকে, সেই যুবককে,
যার শরীর থেকে বেরোয় পাহাড় ডিঙ্গানোর গন্ধ
কখনোবা দেখা যায় হাতে অনাবিল নক্ষত্র।

সেই থেকেই সব, সেই যুবক তার হাতের সহস্র নক্ষত্র
পরিয়ে দেয় তাকে, সেই মেয়েটিকে

কখনো বা ঘুমহীন ঘুম মধ্যদুপুরে কখনো
নিরালা বাগানে, জ্যোৎস্নায়, মনে মনে। মেয়েটিও তার
চুল খুলে দিয়ে একরাশ গাঢ় সবুজ আকুল
ঘাসে শুয়ে [illegible]
বলে, থাক সে হৃদয়ে, মনে মনে।

তারপর এক সাথে কত যে নীলিমায় বসবাস, কত
বিকেলে, দুপুরে, বৃষ্টির দিনে—
কখনো শিহরময় লুকোচুরি, যুবক ভালোবাসার ক্রোধে মাতাল খোঁজে
হঠাৎ হারানো মেয়েকে
চোখের অনুশাসনে জল হয়ে পড়ে মেয়ে, হৃদয়বন্দী
ঘোর হারিয়ে যায় দ্রুত একসঙ্গে, শপথ, আমৃত্যু সঙ্গী।
দিগন্তের বুক চিরে অজস্র জলের মতো বাঁধভাঙ্গা
হাসি, নগ্ন কিশোরীর মতো শরীর কাঁপিয়ে
মিশে যায় আকাশের হৃদয়ে।

অকস্মাৎ যুবককে যেতে হয়, বাণিজ্যে, দূর জমানায়।
মেয়ে শুধু পোড়ে আকুল চেয়ে। যুবকের
সেখানে বিষ রূপ স্মৃতি
করে দখল মগজ, যেন মাথার ভেতরে একপাল অশ্বখুর
দাপাদাপি করে ভীষণ, হ্রেষাধ্বনি দিয়ে দূরে
হঠাৎ মরুভূমিতে
হারিয়ে যায়, গোধূলির মতো ব্যাপক সন্ধ্যায় ধুলো উড়িয়ে
বার বার যেন কোথায়।

ঘোর অমাবস্যায় জ্বালিয়ে হৃদয়ের জ্যোৎস্না
যুবক সেখানে গোলাপের শিহরণ নিয়ে বাঁচে। রাত্রির
গ্রীবায় ঠেকিয়ে
অনন্ত অধর বলে, তুমি আমাকে
দিয়েছো নক্ষত্রের অধিকার, এ বিনিময় নয় তবু শপথ
তোমার দোয়েল বসা বুকে আমি
অহর্নিশ দিয়ে যাব দোলন চাঁপা আর লক্ষ রাতের
নির্ঘুম, গভীর তপ্ত লাল ছোঁয়া। মেয়ে,
থাকল জমা তোমার অস্তিত্বে, লাখো চুমা।।

বনপরী

অরণ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, পরিচয় হলো।

ছিলে পরী, ডানা ছিঁড়ে মানুষ হয়েছো।—
তুমি জানো সবুজ রহস্যটিলা, গুপ্তশাস্ত্র, এখন মানুষ
দেখবার নাম করে আমার সন্ধানে বেরিয়েছো।
জানো অন্ধকার হলে মমতায় প্রণয়ীর গলা
মুচড়ে সকল রক্ত শুষে নিতে হয়—
আজ তাই ঝাপিয়ে আসছে কালো মেঘ।

তবু বসি তোমার নিকটে এসে নত।
সফল গোয়েন্দা তুমি' দৃষ্টিচোর, পদচিহ্নভেদী
আমার গোপন সব রাজপথে প্রকাশ করেছো।
তোমার জানুর কাছে বসি তবু; অরণ্য শহর ঢেকে দিলে
ওই কোলে ঘাড় নুইয়ে দেবো।

ঘর

ঘরটি দেখে পিছিয়ে যায় মানুষ।

কেন, এ কেমন ঘরটি আমার জীর্ণ-শীর্ণ অবতীর্ণ
মনের আমার প্রেমে,
একই মতো চারখুঁটির এই জীবন-চৌকির
একটি গেছে ভেঙে?
কীট-পতঙ্গ এবং অনেক অনিষ্টকর প্রাণীর
দলের দেখে তাদের কূটচাল
কাটছে বসে খিলান দিয়ে দাঁত।

ঘরটি আমার এমনতরো ঘর
পোশাক যার পরদেশী কাপড়!

জ্বলে চিতা

সময়ে পেরিয়ে যখন আমাদের দেখা হলো
তখনই আমি ঐ কৃষ্ণচূড়াটি থেকে কিছু ফুল
ঝড়ে যেতে দেখেছিলাম।

তুমি দেখতে পাওনি;
শরীরে শরীর জড়িয়ে থাকা সুন্দর
মলিন এক দৃশ্য নিয়ে নেমে এলো

হারানো বেদনার সেতারায়…
জানতে চাইনি তোমার উদ্ধত চেতনা-বিষ;
প্রলয় হুংকার তুলে
এ তন্ত্রীতে নাচে—
জল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা হতেই
স্থির হয়ে গ্যালো জল
যেন এরকমটি হবার ছিলো।

আমি পরিচয় চাইনি, যে
তুমি আমাকে ডাকতে…

ফাগুনের গান

ফাগুনের নিশ্চুপ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে
কোকিলের সুর ঝরা শীত ভুলিয়ে দেয়—
পুরোনো সব ইচ্ছেরা ম্যাগিলানের সমুদ্র ভ্রমনের
এক পর্ব সমাপ্ত করে।
অন্য কোনো দ্বীপের ঘ্রাণ
বায়ু প্রবাহে অস্থির আলোচনায় রত।

জ্বালনী ভীষণ ব্যয়বহুল।
কোন রাণীর আকর্ষণও দুস্কর।

এরকমই এক মুহূর্তে আমার উপকণ্ঠ
বুকের উঠানামা ফাগুনের ম্লান নিশ্বাসে।
বিশুদ্ধ বাতাস শুধু তোমাকে
আর একটি হাস্নাহেনাকে ঘিরে রেখেছে।
সেনো তোমার ভেতর হাস্নার ঘ্রাণে গহীন থাকে।

আর নেই, ওখানে কোনো কিছুই আর
পদার্পণ করবে না, তোমার স্বাচ্ছন্দে।

তুমিই অবশিষ্ট এক প্রাণ
যদি এই হয় ফাগুনের শেষ গান।

নষ্ট পরিচ্ছেদ

ঘুরছি;
এক সুখী সন্তের সাথে
দেখা হ'বার কথা ছিল।

রূপালী রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে
সান্ধ্যকালীন এক
মনোরম দৃশ্যের পাশে
তিনি কৃপা করবেন আমাকে।
"আমার চৌদ্দপুরুষ থেকে
তিনি দেখা করবেন
এক অলৌকিক বিশ্বাসে।"
তাঁর জন্য কত
দুধ-রুটি-কলা ক্ষয়েছে;
জমিয়ে রাখলে 'পর চৌদ্দপুরুষ
বসে খেতো নাহয়;
বারোপুরুষ তো!

ফিরছি;
এক দুঃখী সহোদরের সাথে
দেখা হয়ে গেল বলে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

রূপকথা

সামরিক ক্যু হবার পর সকল কু বাজেয়াপ্ত করা হলো।

কোকিলেরা অতি দ্রুত পাল্টে নিলো পরিচিত ডাক,
পাখিদের পাঠ্যসূচি থেকে কুহু স্বর পরিত্যক্ত হলো।
জলেদের কুলকুল চলাফেরা থেমে হলো ল'ল ধ্বনি,
কুস্তিগীর, কুবিহীন স্তি নিয়ে জমালো আসর।
ঈদের নামাজ শেষে মুসল্লিরা কোলাকুলি করলো বটে
কোলাকুলি বন্ধ হলো।

কুলীনেরা লীন হলো, কুকাজ দাঁড়ালো শেষে কাজে।
কুমীর হিংস্রতা ভুলে মীর হয়ে মাথায় পরলো টুপি,
কুমারীরা অতিদ্রুত মারী মন্বন্তরে গেল ভেসে।
কুমন্ত্রণা অতপর মন্ত্রণার মর্যাদা জোটালো—

কুয়াশারা আশা হয়ে নিয়ে এলো
নিরাশার শব্দহীন ঝড়।
আর কুকুরেরা হয়ে উঠলো 'র' অর্থাৎ খাঁটি,
কুলোক সকল লোকে রূপান্তরিত হলেন,
বিভিন্ন প্রথম সারিতে তাদের মুখ জ্বল জ্বল করতে থাকলো।

নটে গাছটি মুড়োলো—
অতপর কুবিহীন সুসময় বেতারে টিভিতে
প্রকাশিত হতে থাকলো প্রত্যেক দিন।।

শামীম কবীর

খুব ক্রুর মুখোশের মতো মনে হয় এই নাম। অতিকায় রূপালী তিমির মতো আমার মর্মমূলে এই খুব নিবিড় আপন নাম নিদ্রিত রেখেছে এক বিশুদ্ধ আগুন (তন্দ্রায় নিবে গ্যাছে তার সব তুখোড় মহিমা)—এই প্রিয় সশরীর নাম খুব দাঁতাল মাছির মতো অস্তিত্বের রৌদ্র কুরে খায় রাত্রিদিন; আষ্টে পৃষ্ঠে কাঁটাতার হোয়ে আছে—শামীম কবীর এই তুচ্ছতর নাম ঃ গোপনে, ত্বকের নীচে খুব নিরুপায় এক আহত শিকারী নামের মোহন ফাঁসে জড়ায় তিমির।

ইতিহাসে অমরতা নেই। পরিবর্তে রাশি রাশি বুলেটের দক্ষ কারুকাজ করোটিতে, দগ্ধ লাশময় দীর্ঘ উপত্যকা আর নীলিমার বোঁটা থেকে অনর্গল—নির্ভার নিঃস্বদের জাতীয় সঙ্গীত ঝ'রে পড়ে; ক্যাবল কুচক্রী এই নাম—পাকা নিকারীর মতো রোয়েছে অমর য্যান, আমার সকল পথে অক্ষয় জালের ব্যূহ কোরেছে আরোপ কোন দুর্বার শপথে।।

সমুদ্র দন্ড

বস্তুত কোনোদিন ভুলেও কোনো কটু বাক্য বলিনি কাউকে আমি, কারো মনে কোরিনি আঘাত, বরং নিজের দীনতাকে রেখেছি আড়ালে ধরাবর, নীরবে—হীনগোত্র চতুষ্পদের মতো অন্যদের ছায়ার পিছনে খুব ঘুরেছি খুঁড়িয়ে। যাকে বলে প্রকৃত প্রণয়, তার পাইনি আস্বাদ; শুধু নারীদের ছায়া শরীরের ঘ্রাণে কাতর হোয়েছি আর আঁধার রোয়াকে বোসে দূরাগত কলহাস্য-গম্ভীর গর্জন শুনেছি তাদের—কোনোদিন পারিনি নিকটে যেতে, শুধু জাল বুনেছি স্বপ্নের।

অথচ সবাই মিলে আমাকেই দন্ড দিলে—সমুদ্রে যাবার! আমিতো ধুলোর মতো ছিলাম পায়ের নীচে, স্তব্ধতার হিমে; সব ভার সোয়েছি নীরবে ঃ তোমাদের কান্ড-কীর্তি অবিকার দেখে গেছি; এমনকি হৃদয়ের প্রতিশোধ স্পৃহাটুকু ঘুমে জাগরণে কখনোই কোরিনি প্রকাশ। শুধু ভুলে একবার আকাশ দেখেছি বোলে আমাকেই দন্ড দিলে সমুদ্রে যাবার?

এই ঘরে একজন কবি

এই ঘরে একজন কবি আছে রক্তমাখা গালিচায় শুয়ে
কুয়াশার মতো—তার নিদ্রামগ্ন ভাসমান চোখে ধীরলয়ে
শীর্ণ এক নদীর প্রতিমা ফ্যালে সুরময় ছায়া, শতাব্দীর
শুদ্ধতম শিলাখন্ড শিয়রে তার—ঠিক একগুঁয়ে
ধীবরের মতো : ছিন্ন ভিন্ন—ছেঁড়া জালে কৌশলে মরা নদীর
শ্রোণী থেকে অপরাহ্নে রুপালী ইলিশ ছেঁকে নেবে; পঁচা ঘা-য়ে
গোলাপের মধু ঢালা—অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে য্যান। ভীষণ অস্থির
হাতে সে ক্যাবল বিষন্ন খুঁড়ে চলে শব্দের গোপন তিমির।

কবির আঙ্গুল থেকে অনর্গল রক্ত ঝরে আর মূর্তিবৎ
অন্ধকারে প'ড়ে থাকে সে—ক্যামন মর্মন্তুদ অদৃশ্য বল্কলে
ঢেকে অস্তিত্বের ক্ষত। অবশ্য মাঝে মাঝেই বদ্ধ ঘরময়
গলিত বাতাস কাঁপে—অন্তর্গত সজীব গর্জনে : বাঁধা গৎ
ভুলে গিয়ে—নিদ্রিত কবির বীণা সহসা কী প্রখর আদলে
গড়ে সুরের প্রতিমা, অথচ খোলেনা তার অন্ধ চক্ষুদ্বয়।।

পৃথক পালঙ্কে

(কবি আবুল হাসানকে নিবেদিত)

তুমি ঠিক পলাতক নও। আমিতো এখনো দগ্ধ তৃণভূমি
থেকে পাই উপবাসী ভেড়াদের বিক্ষুব্ধ শিং-সঙ্কেত; তুমি
কি উটের মতো জ্বলন্ত ক্যাকটাসের জমাট জল তরঙ্গ
এখনো শুনতে চাও, নাকি ঘুমের ভেতরে শুয়ে—সমকামী
আর হিজড়েদের ত্রুটিহীন ব্রহ্মনৃত্য দেখবে ? স্বপ্ন ভঙ্গ—
জানি তুমি অক্লেশে সোয়ে নাও, তবু—রাত্রির মতো নিম্ন গামী
কালো জলে ভেসে যদি যায়—জননীর মতো অসহায়—বঙ্গ
তোমার, তুমিও তো পারবেনা ঠিক এড়াতে যন্ত্রনার সঙ্গ।

তোমার মর্মমূলে নিসর্গের শীর্ণ লাশ সর্বদা কল্লোলিত
শ্মশানের প্রেতী গান গায়, অরণ্য-মঞ্চে এক অন্ধ নায়ক
রাতদিন তোমার অনুকরণে করে বৃক্ষপূজা, সপ্নাতঙ্কে
নীল কিশোরীর বুকে মোহন তোমার বাঁশী বাজে——উন্মোচিত
সত্য-সম জানি সব, হে—পাতক স্বর্গের বাগানে পলাতক
নও তুমি, নির্বাসিত হোয়ে আছো—স্বপ্নহীন পৃথক পালঙ্কে।।

বিবৃতি

অন্ধ মাত্র জেনে গেছি—সবকিছু ক্ষণজন্মা, স্থায়ী কিছু নেই
পৃথিবীতেঃ কখনো ছিলোনা কোনো কুমারীর অনন্ত বৈভব
সতীত্বের, সংগোপনে—তার খুব নিভৃত দেহের ছায়াতেই
একদিন প্রজন্মের তীব্র ভ্রূণ পুঁতেছে মানুষ; কী নীরব
দর্শক সেজে—ক্যাবল ঈশ্বর শূন্যতার নিজস্ব ঘেরেই
অক্ষম বন্দী চিরকাল। বস্তুত সকলই ধোঁকা, মিথ্যে সব—
ভালোবাসা/ঘৃণা, গূঢ় শিল্প রস এবং মানুষ—প্রত্যেকেই
বাস্তবিক ভীষণ ভঙ্গুর; ক্রমশঃ শুকায় স্মৃতির অর্ণব।

বেজন্মা দেবতারাই যুগে যুগে উচ্চাসীন, আর কী প্রখর
অগ্নি-মুক্তি বুকে কোরে প্রমিথিউসেরা সব—গাঢ় স্তব্ধতার
হিমে ম'রেছে খুঁড়িয়ে। মানুষেরা বড়ো বোকা, চিরকাল ঝড়
প্লাবনের নীচে, শুয়োরের বাচ্চাদের পঁদতলে বারবার
চিরে চ্যাপ্টা—মাটিতে মিশেছে। আমি তো গর্ধভ নই, যে—ক্যাবল
মানুষের গান গেয়ে রাজরোষ নেবো,—তাই দেবতার ঢোল···

জন্মান্ধের ভূমিকা

জন্মাবধি অন্ধ হোয়ে আছি—সশরীর, এড়িয়ে ধুলোর মতো—
গাঢ় রৌদ্রালোক দুইচোখে। ঘয়েসী বটের মূলে গুপ্ত ক্ষত
দেখিনি তাকিয়ে কোনোদিন, অথবা আড়াল থেকে নির্নিমেষ—
জোস্নালোভী নারীদের পাহাড়ী গ্রীবার ভাঁজে তীব্র অনুদিত
গোলাপ শিশু; পরিবর্তে আমার চৈতন্য স্রোতে কী দগ্ধ শেষ
নিঃশ্বাস ফেলে ছায়া হয় ইতস্তত ছিন্ন মেঘেরা; ঘুমন্ত
ঈশ্বরের মতো, মনে হয়—বহুকাল প'ড়ে আছি জলশেষ
শুকনো কাদায়, ত্বকের নীচেও আছে খুব গাঢ় ছদ্মবেশ।

আমার গুহার কার্ণিশে সবুজ সতেজ অর্কিড প্রতিদিন
রৌদ্র খায়, বাতাসের উন্মুক্ত গালিচায় নির্ভেজাল প্রাচীন
অশথের মতো ছড়ায় শেকড়; ক্যাবল স্মৃতিনষ্ট আফিমে
আচ্ছন্ন রোয়েছি বোলে, গুহার আঁধারে আমি মায়াবী পিদিমে
খুঁজি রৌদ্রের প্রতিমা, আর ত্রুটিহীন জন্মান্ধতা হেতু—করি
আরাধনা নর্তকীর ঃ নির্ভুল মুদ্রায় নেচে যদি পাই সিঁড়ি।।

অথচ আমার চোখ

কেউ কেউ বলে বটে—এ আমার ভুল প্রেম। এ-রকম—খোঁড়া
নর্তকীর সাথে রাস্তায় বেড়ানো, আশে-পাশে লক্ষ মানুষের
খুব ঝাঁঝালো অবস্থিতি অগ্রাহ্য কোরে—খোলা সড়ক দ্বীপের
ধারে পা ঝুলিয়ে বোসে তার তেজী নৃত্যকলাময়—সুতো ছেঁড়া
অতীতের নিখাদ মলিন গন্ধ শোঁকা, খুব অন্যায়। তা-ছাড়া
যে সুরের রেশ নেই বর্তমানে, নিহত যে পাখি, এ-তো ঢের
বোকামী—তার দগ্ধ পালকের নীচে প্রচ্ছন্ন অবচেতনের
ঘোরে প্রকৃত উষ্ণতা অন্বেষণ; এ-তো অতি স্বপ্নেরও বাড়া।

অথচ আমার চোখে বিস্ফোরণের মতো লাল-নীল, ঈষৎ
ম্লান জ্ব'লে ওঠে দীপ্র ঝাড়বাতি, চন্দ্রালোকি জলসা ঘর—
তবলায় তুফান, তুমুল নূপুর ধ্বনি, তন্ময় নহবত
কানে বাজে, অবশেষে—কুয়াশায় নর্তকীর হিল্লোলিত উরু,
পদ্মের পাতার মতো পায়ের কাপন আর বক্ষ তোলে ঝড়
আমি দেখি, আবার—খোঁড়া নর্তকীর পায়ে তীব্র নাচের শুরু॥

একজন রৌদ্র

[উৎসর্গ : নূর হোসেন]

একজন রৌদ্র থেকে গাঢ় স্বরে শোনালো বিষন্ন শব্দাবলী—
—আমার মৃত্যুর পর, এ-রকম রৌদ্র জেনো উঠবেনা আর,
ফুল ঝ'রে যাবে, থেমে যাবে পাখিদের গান, প্রগাঢ় ছায়ার
শীতে যাবে বনভূমি মাঠ ছেয়ে, শহরের সবকটা গলি
উপগলি ভ'রে যাবে ব্যাঙের ছাতায় আর অনুর্বর পলি
জ'মে যাবে শস্য ক্ষেতে; মধ্যরাত ভেদ কোরে কোনো সূর্যরঙ
আর পারবেনা বানাতে প্রতিমা সুন্দরের, বেবুশ্যার ঢঙ
অবলা-মহলে জনপ্রিয় হবে খুব, হবে স্নিগ্ধতার বলি—

—আমার মৃত্যুর পরে অনেকেই কোরবে বিলাপ; কী নিবিড়
মানবিক বিলাপ ধ্বনিতে যাবে নাভিমূল ছিঁড়ে স্তব্ধতার,
যে ভাবে বিয়োয় শিশু, গর্ভবতী নারী, সে-রকমই তিমির
বিদারী হবে রৌদ্রহীনতার প্রতিবাদ : মুকুটের কিনার
বেয়ে সম্রাটেরা নিশ্চিত লুটাবে ধূলায়, বেজন্মা দেবগণ
ঠিক জানি নির্বাসিত হবে—এই বোলে স'রে গ্যালো আরজন॥

এই শহরে

ম্লান চোখে লাল ধূলো উড়িয়ে চোলে যায় মফস্বলের বাস
আর আমি ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ার ভয়ে সট্‌কে পড়ি
দ্রুত (এ শহরে যতো ব্যাংক, হাসপাতাল আশ্রম কিম্বা বাড়ি
ততো নেই)। দেখি, দূরে অসংখ্য উটকুঁজো বৃদ্ধ রাজহাঁস
সন্ন্যাসিনীর মতো দীপ্র, অকস্মাৎ দিনান্তের গাঢ় নির্যাস
রেখে মিলালো কোথায়; শূন্যপথে শুধু কোন স্বপ্নভ্রষ্টা নারী
এক বহুমিশ্র যোনি সন্তাবে অকৃপণ ভ'রে দ্যায় সারি সারি
পান পাত্র—হেসে। থম্‌কে দাঁড়াই, চোখ ব্যেপে আসে হতোচ্ছ্বাস।

অতঃপর আমি য্যান প্রহৃত অর্ফিয়ুস, হারানো বীণার
খোঁজে ঘুরে মরি দিকভ্রষ্ট পথে। মাঝে মাঝে বাতাসের মাত্রা
হীন গূঢ় সংলাপ স্বপ্ন শূন্য খ্রীষ্টপূর্ব শিকারীর মতো
সঙ্গীণ উঁচিয়ে ধরে: আমি কোন অন্ধচক্রে ডুবি খুব, আর
এই শহরের স্মৃতি ভস্মে বহুমানুষের দীর্ঘ শবযাত্রা
জেগে থাকে দুঃস্থ প্রেতের মতো অহর্নিশ, দারুণ আহত।।

অনুসরণ

একজন অবিকল আমার মতোন লোক আজ সারাদিন
আমার সামান্য পিছে চলমান, যে রকম বিশ্বস্ত কুকুর
যে দিকেই যাই আমি, এলেবেলে ঘুর পথে, খুব শব্দহীন
পেছন পেছন সে-ও চলে; পার্কে, নদীর ধারে—শিষ্ট মন্থর
য্যান পেখম গোপন কোরে আমার পেছনে চলে উদাসীন
পথিকের মতো। অকস্মাৎ পেছনে তাকালে দেখি, অল্পদূরে—
আনমনে ধরাচ্ছে সিগার সে, অথবা কখনো খুব মিহিন
রুমালে মোছে গরদানের ঘাম; বোঝো সে ক্যামন সুচতুর!

বুঝিনা, সে কী কারণে এমন নাছোড় চলে, এ-তার ক্যামন
ব্যবহার: অবিকল আমার নকল কোরে মুখের গড়ন,
দৃষ্টির খরতা আর জটাদার চুলের বহর, বেশবাস—
ক্যাবল ভিন্ন চলার প্রকৃতি তার; আমি চলি একা, আপন
খেয়ালে, আর সে আমার নিবিড় পেছনে ধায় জ্বলন্ত শ্বাস
কোরে সযত্নে—গোপন, অদৃশ্য সঙ্গীণ হাতে, নিজস্ব সন্ত্রাস।।

আমার বয়স থেকে

আমার বয়স থেকে একে একে স'রে গ্যাছে সবুজ ঋতুরা।
য্যামন শব্দের মৃত্যু কবিকে বিষণ্ন করে—অথচ কবিরা
শোকগাথা ল্যাখেনা তাদের, আমিও তেমনি ঠিক—অবিকার
দেখে গেছি—বসন্তের সীমানায় বৃক্ষদের হু-হু ঝ'রে পড়া,
দেখেছি ঝড়ের মতো খ্যাপা শৈশবের মৃত্যু, আড়ালে যাবার
আগে সঙ্গীদের হার্দ্য বাচালতা আর স্বপ্নদের—মর্মছেঁড়া
কী তীব্র অন্তর্ধান ; অতঃপর ভুলে গেছি, শূন্যে হারাবার
আগে যে-রকম ঢেউ উপকূলে দ্যাখে তার শেষ অভিসার।

অথচ হে শিশিরের গন্ধমাখা স্বপ্নচারী সবুজ কিশোরী—
তোমাকে তো কখনোই পারিনা কিছুতে ভুলে যেতে ; সগোপনে
তোমার ঊন্মীল চোখ, গাঢ় স্বর—সর্বদাই, তন্দ্রা-জাগরণে
আমাকে মাতায় খুব ; আর শোনো মেয়ে, যে ছবিই আঁকি—নারী
কিম্বা রূপালী মানবী—তোমার সম্পূর্ণ রূপ পারিনা ফোটাতে।
এবং—হে প্রেম, তুমি চিরকাল দূরগামী, ভিন্নতর পথে॥

স্থগিত স্বপ্নের মতো

[মামুন রায়হান' বন্ধুবরেষু]

মাঝরাতে কে ভাঙ্গালে ঘুম ওষ্ঠ ছুঁয়ে, মাছের মতোন ভুস
কোরে ভাসালে অলক্ষ্য স্মৃতি স্বপ্নের নীল সরোবরে ? প্রবল
বৃষ্টির তোড়ে য্যান ভেসে গ্যালো সব, সমস্ত নাদুস নুদুস
কীর্ণ কঙ্কালেরা—আমার নিজস্ব স্বর্গ থেকে। কে তুমি ! ধবল
বকের মতো উপমা সন্ধানী· রূপালী চঞ্চুর ঘা-য়ে বেহুঁশ
আফিমী ঘুমে—বিবর্ণ মরুদ্যানে ছিঁটালে বরফ গলা জল !
জানোনা কি—স্থগিত স্বপ্নের মতো গেঁথে আছে প্রজ্জলিত ক্রুশ
এক আমার সত্তায় ?—তার দাহ নয় মোটে সহজ সরল।

আসলে কী চাও তুমি, রাত্রির ও-পার থেকে বাজাবে আমার
শীর্ণ—ছায়া-শরীরের ভাঙ্গা বীণা, না কি দেবে খুব নির্ভেজাল
জলে স্মৃতির লালিমা ধুয়ে মুছে ?—বস্তুত নিজস্ব পরিখার
ঘেরে বন্দী হোয়ে আছি আমি, পারবেনা মর্মভেদী কোনো জাল
ছড়াতে আমার পথে ঃ আমার তো অস্ত্র নেই, নেই তীব্র হেম,
মর্মমূলে গেঁথে আছে শুধু এক কিশোরীর অস্বার্থক প্রেম॥

সাফল্যের শিখরে
আরোহণ করতে চান ?

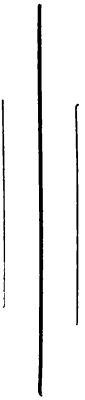

এন বি এল পরিবারে যোগদিন

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক